ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগিণী সিন্ধুকাফি—তাল তেওরা।

তুই পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিস্
হৃদয়-দেউল মাঝে
ভক্তি-প্রেমের ধূপটি পোড়াস্
নিত্য সকাল-সাঁঝে!
পাবি যে দিন দুঃখ-ব্যথা
দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা
বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক্
আমার জীবন মাঝে।"

তুই আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস্
তাঁরেই করিস্ রাজা
তাঁর তরে তুই আসন পাতিস্
ফুলের মালা সাজা!
তবুও যদি দেখা না পাস্
চোখের জলে বেদন জানাস্
বলিস্ "প্রিয় তোমার তরেই
এ দেহ প্রাণ আছে॥"

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ॥

সা -া II{ সা সা -া। রা -া। রা -জ্ঞা I রা মা জ্ঞা। রা -া। সা -া I

তুই • পূ জা র্ প্র • দী প্ জ্বা লি য়ে রা • খি স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I ণা ণা -া। ধা -া। পা -া I মপা মজ্ঞা -া। -রা -া। -সা -ন্া }I

হৃ দ য় দে • উ ল্ মা ঝে • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I পা -র্সা না। র্সা -া। র্সা -র্রা I র্সা -ণা ণা। ধা -া। -পা -মা I

ভ ক্ তি প্রে • মে র্ ধূ প্ টি পো • ড়া স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I মণা -া ণা। ধা -া। পা -া I মপা -মজ্ঞা -া। -রা -া। -সা -ন্া II

নি • ত্য স • কা ল্ সাঁ ঝে • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

II পা পা -া। পা -া। পা -ধা I না -র্সা র্সা। না -র্সা। র্সা -া I

পা বি • যে • দি ন্ দুঃ • খ ব্য • থা •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I র্সধা -া ণা। র্রা -া। র্জ্ঞা -র্সা I র্সর্রা র্সর্রা -র্মর্জ্ঞা। র্রা -া। র্সা -া I

দে ব্ তা রি • পা য় নো য়া• •স্ মা • থা •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I পা র্সা -ণ। র্সা -া। র্সা -র্রা I র্সা -ণা ণা। ধা -া। পা -ম I

ব লি স্ তো • মা র্ ই • চ্ছা ফ • লু ক্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I মণা ণা -া। ধা -া। পা -া I মপা মজ্ঞা -া। -রা -া। সা ন্া II

আ মা র্ জী • ব ন্ মা ঝে • • • "তু ই"

৬

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সা -া II ধ্া -া ণ্া। রা -া। রা -জ্ঞা I রজ্ঞা -মা জ্ঞা। রা -রা। সা -া I
তু ই আ প্ না কে • তাঁ র্ ভূ• • ত্য রা • থি স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ণা ণা -া। ধা -ধা। পা -া I মপা মা -া। -জ্ঞা -া। -রা -া I
তাঁ রে ই ক • রি স্ রা জা • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা র্সা না। র্সা -া। র্সা -র্রা I র্সা ণা -া। ধা -া। পা -া I
তাঁ র ত রে • তু ই আ স ন্ পা • তি স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ৩
I মা ণা -া। ধা -া। পা -ধা I গা মা -া। -া -া। মা -া II -া -া II
ফু লে র্ মা • লা • সা জা • • • "তু ই" • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II পা পা পা। -া -া। পা ধা I না র্সা -া। না -া। র্সা -া I
ত বু ও • • য দি দে খা • না • পা স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধা ণা -র্রা। র্রা -া। র্জ্ঞা -া র্স I র্রা র্সর্রা -র্মজ্ঞা। র্রা -া। র্সা -া I
চো খে র্ জ • লে • বে দ• • ন্ জা • না স্

১ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা র্সা -না। র্সা -া। র্সা -র্রা I র্সা ণা -া। ধা -া। পা -মা I
ব লি স্ প্রি • য় • তো মা র্ ত • রে ই

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা ণা -া। ধা -া। পা -া I মপা মজ্ঞা -া। -রা -া। সা -ন্া II II
এ দে • হ • প্রা ণ্ আ ছে • • • "তু ই"

মলয় বায়ু।

ভৈরবী—দাদরা।

সুমন্দ মন্দ বহে সুগন্ধ মলয়জ মন হরিয়ে,
বারতা আনি' তাঁরি শুভ আকুলিছে পরাণহিয়ে ;
সুরনর চরণে তাঁরি সকলি দিতেছে সঁপিয়ে ;
তাঁরে ঋষিমুনি যাইয়া বরণিতে আসে ফিরিয়ে ॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফুল।

ভৈরবী—দাদ্‌রা। (ঠুম্‌রী টপ্পা)

সুমন্দ গন্ধ অতি সুন্দর জগ জন মন ভাওয়ে,
সুমন বিন কোই কারজ জগমে ন সুহাওয়ে।
দেবগণ কো পূজা লিয়ে সুমন বিন নাহি হোয়ে
অ্যায়্‌সী গুণকারী সুমন বরণন নাহি জাওয়ে ॥

সুর ও কথা—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

আস্থায়ী।

১´ • ১´ • ১´
{ পা পা পা। দা ণা দপা। মা পা মজ্ঞজ্ঞা। -া রা জ্ঞা। সা ঋা ণ্া।
হিন্দী গান—সু ম ন গ ॰ ন্ধ॰ অ তি সু॰ ॰ ন্দ র জ গ জ ॰
বাঙ্গালা গান—সু ম ন্দ ম ॰ ন্দ॰ ব হে সু॰ গ ॰ ন্ধ ম ল য়

• ১´ • ১´ •
সা ঋা মা। জ্ঞজ্ঞা ঋসা ণ্া। সা -া -া } সা দা দা। -া পা পা।
ন ম ন ভা॰ ॰॰ ॰ ওয়ে ॰ ॰ সু ম ন ॰ বি ন
জ ম ন হ॰ ॰॰ রি য়ে॰ ॰ ॰ বা র তা ॰ আ নি

১´ • ১´ • ১´
দা র্সা ণদা। ণা দা পা। জ্ঞা পা পা। পা দা পা। মা জ্ঞা মা।
কো ই কা॰ ॰ র জ জ গ মে ন ॰ সু হা ॰ ॰
তাঁ রি গু॰ ॰ ভ আ কু লি ছে প ॰ রা ণ ॰ হি

•
জ্ঞা রা জ্ঞা II
ওয়ে ॰ ॰
য়ে ॰ ॰

অন্তরা।

১´ • ১´ • ১´
{ দা -া মা। দা দা ণা। র্সা -া র্সা। -া র্সা র্সা। র্সা র্ঋা র্জ্ঞা।
দে ॰ ব গ ণ কো পূ ॰ জা ॰ লি য়ে সু ম ন
সু ॰ র ন র চ র ॰ ণে ॰ তাঁ রি স ক লি

• ১´ • ১´ •
-া র্ঋা র্সা। ণা র্সা ণা। দা -া পা } জ্ঞা -া পা। -া পা পা।
॰ বি ন না ॰ হি হো ॰ য়ে অ্যায় ॰ সী ॰ গু ণ
॰ দি তে ছে ॰ সঁ পি ॰ য়ে তাঁ ॰ রে ॰ ঋ বি

১´ • ১´ • ১´
দা র্সা ণা। দা পা পা। জ্ঞা পা পা। পা দা পা। মা জ্ঞা মা।
কা ॰ রী সু ম ন ব র ণ ন না হি জা ॰ ॰
মু ॰ নি যা ই য়া ব র ণি তে আ সে ফি ॰ রি

•
জ্ঞা রা জ্ঞা II II
ওয়ে ॰ ॰
য়ে ॰ ॰

১´ •
১ম তান—ণ্সা জ্ঞমা পদা। ণর্সা র্ঋর্জ্ঞা র্ঋর্সা।
আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

১´ •
ণদা পণা দপা। মজ্ঞা ঋসা ণ্সা।
॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

১´ •
২য় তান—র্ঋর্জ্ঞা র্ঋর্সা র্ঋর্সা। ণর্সা ণদা ণদা।
আ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰॰॰

১´ •
পদা পমা পমা। জ্ঞমা জ্ঞঋা সসা।
প॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰

কালবৈশাখী।

মিশ্রবাহার—দাদ্‌রা।

আমি বেতালা বিঘোরা পাগলপারা
কালবৈশাখীর আকুল ধারা
দুর্দম মোর চরণ ভঙ্গ
ক্ষতবিক্ষত ধরণী অঙ্গ
নিমেষের মাঝে সকল হারা
কালবৈশাখীর আকুল ধারা
আমি সহসা আসিয়া সহসা থামিয়া
আপন দর্পে সরমে সারা
লুকাই আঁধার গগনমাঝে
যেথায় জ্বলিছে সন্ধ্যা তারা।
পড়ে রয় শুধু প্রবল বাতে
ছিন্ন ধরণী প্রলয়াঘাতে
ভয়ে কম্পিত বিকলপারা
কালবৈশাখীর আকুল ধারা।

সুর ও কথা—শ্রীরমলা [illegible]

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

না না। না র্সা র্সা। ণা পা পা। মা মা -া। পা পা -া। জ্ঞা -া জ্ঞা।
আ মি বে তা লা বি ঘো রা পা গ ল্ পা রা ॰ কা ল্ বৈ

-া জ্ঞা মা। রা রা -া। সা সা -া। প্‌া -া সা। সা সা -া। মা মা মা।
॰ শা খীর আ কু ল্ ধা রা ॰ দু র্ দ ম মো র্ চ র ণ

মা -া পা। ণা ণা পা। মা জ্ঞা মা। পা না না। র্সা -া র্সা। র্সা র্মজ্ঞা র্জ্ঞা।
ভ ॰ ঙ্গ ক্ষ ত বি ॰ ক্ষ ত ধ র ণী অ ॰ ঙ্গ নি মে ষে

র্মা র্রা র্রা। র্সা র্সা ণা। র্সা ণা পা। জ্ঞা মা জ্ঞমা। পা পা পা।
র্ মা ঝে স ক ল হা রা ॰ কাল্ ॰ বৈ ॰ ॰ শা খীর

রা রা -া। মা মা -া॥
আ কু ল্ ধা রা ॰

ধ্‌া ণ্‌া। সা মা মা। মা মা মা। জ্ঞা মা জ্ঞা। রা সা সা। সা পা পা।
আ মি স হ সা আ সি য়া স হ সা থা মি য়া আ প ন

মা জ্ঞা জ্ঞা। সা জ্ঞা মা। পা পা -া। ধা ধা -া। ধা ণা র্সা। ণা পা পা।
দ ॰ র্পে স র মে সা রা ॰ লু কা ই আঁ ধা র্ গ গ ন

মা পা -া। জ্ঞা জ্ঞা -া। মা ণা পা। জ্ঞা -া মা। রা সা -া।
মা ঝে ॰ যে থা য়্ জ্ব লি ছে স ॰ ন্ধ্যা তা রা ॰

মা ধা ধা। -া ধা না। না র্সা র্সা। র্সা র্সা -া। র্সা না র্রা। র্জ্ঞা র্সা র্সা।
প ড়ে র য়্ শু ধু প্র ব ল বা তে ॰ ছি ॰ ন্ন ধ র ণী

র্সনা র্রা র্সা। র্সা ণা ধা। ধা ণা ধণা। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্মা র্জ্ঞা।
প্র ॰ ল য়া ঘা তে ॰ ভ য়ে ক ॰ ॰ ম্পি ত বি ক ল

র্রা র্সা -া। জ্ঞা মা জ্ঞমা। পা পা পা। রা রা জ্ঞা। সা সা -া II
পা রা ॰ কা ল্ বৈ ॰ ॰ শা খীর আ কু ল্ ধা রা ॰

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব।

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চৌষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে; ঐ দিন তিনি পঁয়ষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দিবস নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে শান্তিনিকেতনে উৎসব হইয়াছিল।

আচার্য্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

পঞ্চষষ্টিতম জন্মতিথি-উৎসব কার্য্যাবলী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩২।

প্রাতে ৬ষ্ঠ ঘটিকা

১। শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিলে আচার্য্যের গৃহ "উত্তরায়ণে", সকলের উপবেশন।

২। গান।

৩। আচার্য্যের আগমন।

৪। সকলের দণ্ডায়মান হইয়া বেদগান ও মন্ত্রপাঠ।

৫। আশ্রমবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বস্তিবচন-পাঠ :—

আচার্য্য, গুরো, তাত, কল্যাণমিত্র, শ্রেষ্ঠ,
আশঙ্কাং সময়ংস্তমো বিদলয়ন্নাশাঃ সমুদ্বোধয়-
ন্নানন্দং জনয়ঞ্জগজ্জনমনঃপ্রেমাঙ্কুরং রোপয়ন্।
শান্তিং সংঘটয়ন্ সমস্তবসুধাশ্রেয়শ্চ সংসাধয়-
ন্নদ্যায়ং তব বর্ষবৃদ্ধিদিবসং প্রাপ্তঃ পুনঃ পুণ্যতঃ॥

তদদ্য ইদং বয়মাশাস্মহে—
এষ ত্বাং সবিতা ধিনোতু ভগবান্ যজ্জ্যোতিরাদীপ্যতে,
ত্বাং পান্বাশ্রমদেবতা ভগবতী নিত্যং প্রসন্নান্তরা।
জীব ত্বং শরদাং শতং স্ফুটতরং বিশ্বস্য পশ্যঞ্ শিবং
তৃপ্যত্ত্বেতদনারতং চ ভুবনং শান্তিং পরমাগতম্।

৬। আচার্য্যকে মাল্যচন্দনাদি দান।

৭। শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও আনন্দবাদ্য।

৮। বীণাবাদন।

৯। আশ্রম-কন্যকা ও পুরন্ধ্রী-গণের প্রশস্তিপাত্র লইয়া আগমন ও আচার্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান।

১০। কবিতা-আবৃত্তি।

১১। গান।

প্রাতে ৭ম ঘটিকা

উত্তরায়ণে জলযোগ।

প্রাতে ৭॥০ম ঘটিকা।

১। পঞ্চবটী রোপণ ও উৎসর্গ

কর্ত্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহম্।

কর্ত্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ স্বস্তি' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

কর্ত্তা।

ওঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ওঁ ঋদ্ধিঃ' ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

সদস্যগণ।

ওঁ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্।

কর্ত্তা।

ওঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পূর্ণিমায়াং তিথৌ স্ববর্ষবৃদ্ধিদিবসে শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা পান্থপশুপক্ষিণাম্ অন্যেষাং চ প্রাণভৃতাং হিতায় চ সুখায় চ এতাং পঞ্চবটীং রোপয়ামি রোপয়িত্বা চ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎসৃজামি।

সদস্যগণ।

ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু, ইদং সিধ্যতু। সাধু, সাধু, সাধু।

আশ্রম-কন্যকা ও পুরন্ধ্রীগণ-কর্ত্তৃক শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, আনন্দবাদ্য।

২। কন্যকা ও পুরন্ধ্রী-গণের প্রশস্তিপাত্র হস্তে তিনবার পঞ্চবটীর প্রদক্ষিণ করা হইলে শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য আনন্দ-বাদ্যের সহিত তাহার রোপণ।

৩। স্মৃতিগাথাপ্রতিষ্ঠা—
পান্থানাং চ পশূনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছয়া।
এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা॥

৪। গান—

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্ম্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্ম্মর তব রবে ?
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।
পথিক-বন্ধু, ছায়ার আসন পাতি',
এস শ্যামসুন্দর।
এস বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা
রচি' দাও রাতে সুপ্ত-গীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

মধ্যাহ্ন ১১শ ঘটিকা

আহার।

অপরাহ্ণ ৫ম ঘটিকা

জলযোগ।

রাত্রি ৭ম ঘটিকা

১। অভিনয়—"লক্ষ্মীর পরীক্ষা।"

২। গান।

রাত্রি ৮॥০ ম ঘটিকা

আহার।

অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী, এই পাঁচটি বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। নিকটে একটি কূপও খনিত হইবে।

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা"র অভিনয় আশ্রম-কন্যাকাগণ করিয়াছিলেন; কেবল লক্ষ্মী-দেবীর ভূমিকা কলিকাতার কোন মহিলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল।

সমুদয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

উপরে যে নূতন গানটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল।*

সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িকতা।

(শ্রীবাণী দেবী)

বর্ত্তমান যুগে মানবের জ্ঞানের সকল বিভাগেই জাগরণ দেখা দিয়াছে। সঙ্গীত-বিভাগও যে তাহার ব্যতিক্রম স্থল নহে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জাগরণের পথে সঙ্গীত আমাদের আশানুরূপ দ্রুতগতিতে চলিতেছে না। তাহার কারণ আমাদের মনে হয় এই যে, আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার অন্ধ পক্ষপাতী হইয়া আছি। তাহাদের মধ্যে কোন্‌টাই বা সত্য এবং কতটুকুই বা সত্য, অথবা কোন্‌টাই বা অসত্য এবং কতটুকুই বা অসত্য, তাহা বিচার করিতে আমরা বড় একটা অগ্রসর হই না। একথা মানি যে, সেই সকল ধারণা আমাদের মনে বহুকাল ধরিয়া বদ্ধমূল হওয়াতে তাহাদের প্রভাব অতিক্রম করা বহুল আয়াসসাধ্য, এবং সে আয়াস স্বীকার করিতেও অনেকে প্রস্তুত নন।

ভ্রান্ত ধারণাসমূহের মধ্যে একটী প্রধান ধারণা হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে ভৌগোলিক বিভাগ আছে। আমরা সঙ্গীতকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই দুই সুবৃহৎ বিভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের একটা স্থুল বিভাগ-রেখা কল্পনা করিয়া লই। সঙ্গীতের মধ্যে স্বরসম্বদ্ধ বা harmonised কোন কিছু দেখিলেই আমরা তাহা পাশ্চাত্য বিভাগে ফেলিয়া দিই, এবং প্রত্যক্ষভাবে রাগরাগিণীতে অবলম্বিত কোন কিছু দেখিলেই তাহা প্রাচ্যবিভাগে ফেলিয়া দিই। আমাদের ধারণা এই যে, প্রাচ্য অথবা তাহাদের মুখপাত্র ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসম্বাদ বা harmony বলিয়া কোন কিছু ছিলও না এবং হওয়া সম্ভবও নহে—উহা পাশ্চাত্য সঙ্গীতেরই নিজস্ব; স্বরভেদ বা melody-প্রধান * রাগরাগিণী কেবল ভারতীয় সঙ্গীতেরই নিজস্ব—উহা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ছিলও না, এবং হওয়া সম্ভবও নহে। এইরূপ ধারণার ফলে আমরা স্বভাবতই সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রসারের পথে অর্গলরূপে দাঁড়াইয়া আছি। অপরদিকে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে এইপ্রকার একটা অস্ফুট ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদেরও সঙ্গীতকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতে, যথাযথ স্বরবিন্যাসের দ্বারা মিষ্টতামণ্ডিত করিতে সক্ষম হইতেছেন না। সুখের বিষয়, কি ভারতে, কি পাশ্চাত্য জগতে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতার, এই প্রকার ভৌগোলিক বিভাগ ও পার্থক্যের কল্পনা অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইতেছে।

এই প্রকার ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, স্বরভেদ বা melody এবং স্বরসম্বাদ বা harmony সঙ্গীতের এপিঠ ও ওপিঠ—একই সঙ্গীতের বিভিন্ন ছাঁদে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিবার ভাঁজ বা প্রণালী মাত্র। একই মাধ্যাকর্ষণ যেরূপ স্থান ও অবস্থাবিশেষে কোথাও বা জলপ্রপাতে, আর কোথাও বা চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের আকর্ষণে প্রকটিত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশ-কাল-অবস্থার মাহাত্ম্যে কোথাও বা স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীতে, আর কোথাও বা স্বরসম্বাদের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।

আমাদের দেশের সঙ্গীতের ক-খ যিনি জানেন, তিনিই বলিতে পারিবেন যে, এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞদিগের মতে এক-একটা গান বা গৎ এক-একটা বিশেষ রাগ-রাগিণীতে অবলম্বিত থাকে। সেই রাগরাগিণী অন্তর্নিবিষ্ট এক-একটী বিশেষ স্বরবিন্যাসের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরভেদের সাহায্যে সেই স্বরবিন্যাসকে বিকসিত করিয়া তুলিলেই রাগরাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের আত্মা বা কেন্দ্রস্থিত ভাব, এবং

* প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ হইতে উদ্ধৃত।

* আমাদের সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বরটী ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়, পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ন্যায় একাধিক স্বরকে সম্বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হয় না; তাই আমাদের সঙ্গীতের প্রধান অংশকে স্বরভেদ বা melody বলিলাম।

স্বরবিন্যাস হইল রাগ-রাগিণীর শরীর বা আকার। চিত্রের সহিত সঙ্গীতের তুলনা করিলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। আমি যদি সন্তানবাৎসল্য আঁকিতে চাই, তবে সেই সন্তানবাৎসল্য ভাবটাই হইল আমার চিত্রের আত্মা বা মূলকেন্দ্র। তারপর, আমি যখন যশোদার কোলে গোপালকে রাখিয়া সেই ভাবটাকে ব্যক্ত আকার প্রদান করিলাম, তখন সেইটা হইল ঐ চিত্রের শরীর বা আকার। পরিপার্শ্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবলমাত্র যশোদার কোলে গোপালের চিত্র আঁকিয়াই আমি বাৎসল্যভাবের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারি। প্রাচ্য চিত্রে এইপ্রকার অপরিহার্য্য অংশগুলির ভিতর দিয়াই মূল মন্ত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। জয়পুরী, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন চিত্র পর্য্যালোচনা করিলেই আমার বক্তব্য সুবোধ্য হইবে। সেইরূপ যে রাগ-রাগিণী আমি প্রকাশ করিতে চাহিব, সেই রাগ-রাগিণীর অন্তর্নিহিত স্বরবিন্যাসকে তাহার স্ব-রূপে প্রকাশ করাইতে হইবে। এক-একটী স্বরবিন্যাসের বিভিন্ন অকারে—উদারা, মুদারা, তারা এবং উহাদের সংমিশ্রণোদ্ভূত আকারে সমাবেশ, অথবা বিভিন্ন সম্বাদী স্বরবিন্যাসের সংযুক্ত সমাবেশ হইতেই এক-একটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগ-রাগিণীর রূপ পরিস্ফুট হয়– অন্য ভাষায় বলা যায় যে, একএকটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উৎপত্তি হয়। শুদ্ধ হৌক বা মিশ্র হৌক, প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের যে সকল স্বরের দ্বারা কোন একটী রাগরাগিণীর রূপটী ফুটিয়া উঠে, ভারতীয় সঙ্গীতে প্রধানত সেই সকল স্বরের একাধিক স্বরকে ভিন্ন বা পৃথকভাবে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই সাহায্যে সেই রাগরাগিণীর রূপটী প্রকাশ করিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বরবিন্যাসের বা স্বরগ্রামের অন্তর্নিবিষ্ট স্বরগুলির একাধিক সম্বাদী ও অনুবাদী স্বর বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে সমগ্র স্বরগ্রামের সহিত সম্বাদীভাবে একসঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইহাই হইল প্রধান প্রভেদ। ভারতীয় সঙ্গীতে এই কারণে রাগরাগিণী ও তাহারই পরিস্ফুটনে সহায় স্বর-ভেদ প্রভৃতির দিক এত প্রসার ও গভীরতা লাভ করিয়াছে; এবং ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বহুলস্বর স্বরসম্বাদের দিক এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় সঙ্গীতও স্বরসম্বাদের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক-রহিত নহে, এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতও স্বরভেদের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্বন্ধ নহে।

ভারতীয় সঙ্গীতে যে স্বরসম্বাদ ছিল, এবং এখনও যে তাহার ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা আমি আমার "ভারতীয় সঙ্গীত ও স্বরসম্বাদ" প্রবন্ধে (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ফাল্গুন ১৮৪৫ দেখ) সবিস্তার বলিয়াছি। ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে "বহুলস্বর" প্রভৃতি শব্দ এবং তৎসম্বন্ধীয় বর্ণনা এবিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্ত্তমান কালেও সামগান যে ভাবে গীত হয়, তাহাতেও স্বরসম্বাদের সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। সেতারের তার বাঁধিবার প্রণালীর ভিতরেও স্বরসম্বাদের ছায়া সুস্পষ্ট। গৎ বাজাইবার সঙ্গে ঝঙ্কার দেওয়াকে স্বরসম্বাদের আদিম রূপ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বীণ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ঝঙ্কারতারের যে প্রকার বন্দোবস্ত থাকে, তাহার দ্বারাই তো স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ঐ সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের সময়ে স্বরসম্বাদের প্রতি নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ইংরাজীতে যাহাকে Part-singing বা অংশত-গীত বলা যায়, তাহার মূল ভাব হইতেছে, গানের একই অংশ একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন সুরে গান করা। আমাদের দেশে কীর্ত্তন, রামায়ণগান প্রভৃতিতে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কোল প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিসমূহের মধ্যে এই ভাবে গান করা এখনও প্রচলিত আছে দেখা যায়। স্বরসম্বাদের ভাব অন্তরে জাগ্রত না থাকিলে এই প্রকার একই অংশ বিভিন্ন সুরে একসঙ্গে গান করা অসম্ভব হইত।

প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদের প্রাধান্য থাকিলেও যেমন তাহাতে স্বরসম্বাদের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায় না, সেইরূপ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে রাগরাগিণীর অন্তর্নিহিত স্বরভেদপ্রধান স্বরবিন্যাসের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে 'melody' প্রভৃতি স্বরভেদসূচক শব্দের অস্তিত্বই কল্পিত হইতে পারিত না; অথবা ঐ সকল শব্দের বিপরীতভাবসূচক 'harmony', 'chord' প্রভৃতি স্বরসম্বাদসূচক শব্দসমূহেরও আবির্ভাব দেখা যাইত না। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে communal spirit বা সংঘবদ্ধভাব কিছু বেশীমাত্রায় থাকাতেই উহাদের চিত্রেও যেমন পরিপার্শ্বের সহিত সম্বন্ধমূলক পরিপ্রেক্ষার perspective ভাব বেশী ফুটিয়া উঠে, উহাদের সঙ্গীতেও সেইরূপ বহুলস্বর স্বরসম্বাদের ভাবই সমধিক পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সংঘবন্ধনের ভিতরেও যেমন ব্যক্তিগত ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইতেই পারে না, সেইরূপ স্বরসম্বাদের ভিতরেও স্বরভেদের একান্ত অভাব হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বীঠোবেনের 'বিষাদ-ধ্বনি' (sonata pathetique), 'অন্ত্যেষ্টিযাত্রা'(Funeral march) গুণোর (Gounoda) 'নৈশগীতি' (serenade), অথবা স্কটল্যাণ্ডবাসী হাইল্যাণ্ডারদিগের 'পুটবংশী' (bagpipe) বাদ্য প্রভৃতি শুনিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও রাগরাগিণীর পরিচায়ক স্বরভেদ বা একস্বরত্বের অসদ্ভাব নাই।

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশ-কাল-অবস্থার বিভিন্নতার ফলে সঙ্গীতে কোথাও বা বহুলস্বর স্বরসম্বাদ (harmony), আর কোথাও বা একস্বর স্বরভেদ (melody) ফুটিয়া উঠিলেও, সকলদেশীয় ও সর্ব্বজাতীয় সঙ্গীতেরই ভিতর হইতে একটা অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক ভাব উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। সঙ্গীতের মধ্যে ভৌগলিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত একটা সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য হাইল্যাণ্ডারদিগের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় পার্ব্বত্য জাতিসমূহের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই কারণেই স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডার বল, আর এদেশের পার্ব্বত্য জাতিই :বল, উভয় জাতিরই সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতার মনে একটা পার্ব্বত্য ও আরণ্যভাব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সঙ্গীতে এই তত্ত্ব আছে বলিয়াই কোথায় স্কটল্যাণ্ড, আর কোথায় ভারতবর্ষ, উভয় দেশের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশের সুবৃহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশের পার্ব্বত্যজাতির সঙ্গীতে সম্বাদপ্রবণ একটা সবল ভাবের আশ্চর্য্য সমপ্রাণতা পরিস্ফুট দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতে একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত :আছে বলিয়াই দক্ষিণ ইউরোপের সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের সহিত ভারতীয় সমতলক্ষেত্রের সঙ্গীতের এত মিল দেখা যায়। এই কারণেই ইউরোপের অন্তর্গত ইটালি প্রভৃতি দেশের সমতলবাসীই বল, আর ভারতের জাহ্নবীবিধৌত সমতলক্ষেত্রের অধিবাসীই 'বল, উভয়েরই সঙ্গীত শুনিলে শ্রোতার মনে কেমন একটা কোমলকরুণ ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ রসিনির রচনাপ্রণালী আমাদের স্বরভেদমূলক রচনাপ্রণালীকে এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের ভিতর দিয়াই অনেকাংশে স্পর্শ করে। সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের কারণেই কোথায় সেই ইটালি প্রভৃতি দেশ, আর কোথায় এই ভারতের অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি সমতল ক্ষেত্র, উভয়ের মধ্যে শত শত ক্রোশের সুবৃহৎ ব্যবধান থাকিলেও উভয় দেশীয় :সঙ্গীতেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল, শত-স্রোতস্বিনীবিধৌত শস্য-শ্যামল ভাব যেন পরিস্ফুট হইতে চায়; উভয় জাতীয় সঙ্গীতে একটা করুণাত্মক স্বরভেদপ্রবণ কোমলভাবের আশ্চর্য্য সমপ্রাণতা অনুভূত হয়।

সঙ্গীতে যে একটা সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব থাকিবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান হইতে সত্যধর্ম্ম নামিয়া যেমন মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত হইয়াছে; মানবমাত্রেরই আত্মাতে যেমন ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, সেইরূপ একই ভগবানের প্রেমধারা সঙ্গীতের আকারে নামিয়া মানবমাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে; একই ভগবান সঙ্গীতেরও মূল তত্ত্ব মানবমাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব, যথার্থ প্রকৃতি প্রকৃতই সার্ব্বভৌমিক—সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে গেলেই আমাদের মনে এই সংশয় জাগ্রত হয় যে, :সঙ্গীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া প্রকৃতই মূলগত কোন ভেদ বা পার্থক্য আছে কি না—থাকিতে পারেই কি না। মনে হয় যে, একই গোলাপ যেমন মাটির গুণে, জলহাওয়ার গুণে নিজের গোলাপত্ব না হারাইয়াও বিভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ একই সঙ্গীত দেশকাল-অবস্থার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আকারপ্রকার ও বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করে। যে সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশে জলহাওয়ার গুণে স্বরসম্বাদের অভিমুখে ঝুঁকিয়াছে, সেই সঙ্গীতই ভারতে স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণীতে পরিস্ফুট হইবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। এই কারণে আজকাল পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরও অনেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলিয়া সঙ্গীতে কোন বিভাগরেখা টানিতে প্রস্তুত নন।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমার সিদ্ধান্তটীকে দৃঢ় করিতে চাই। সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব ভগবান কর্ত্তৃক মানবমাত্রেরই আত্মাতে নিহিত, সুতরাং সার্ব্বভৌমিক বলিয়াই ভারতেও যে সপ্তস্বরের সাহায্যে সকল গানই গীত হয়, ইউরোপেও সেই একই সপ্তস্বরের সাহায্যে সকল গান গীত হয়। প্রভাতের উদীয়মান কনকতপনের চিত্রেই বল, অথবা সন্ধ্যার অস্তমিত সূর্য্যের চিত্রেই বল, কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সকল স্থানেরই অঙ্কিত চিত্রে প্রভাতের যেমন একটা মূলগত ঐক্য দেখা যায়, সেইরূপ সকল দেশের ও সকল জাতির সঙ্গীতেই প্রাভাতিক ভাবই বল, আর সান্ধ্য ভাবই বল অনেকটা একই ধরণে ব্যক্ত হয়। একবার গ্রামোফোনে আমি একটী বাজনা শুনিয়া বুঝিলাম যে, উহা প্রভাত সংক্রান্ত কোন কিছু বিষয়ক—বাজনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতেছিল যে, ছন্দে ছন্দে তালে তালে উদীয়মান প্রভাততপনের প্রকাশিত হইবার কথাই যেন উহা ব্যক্ত করিতেছে। অবশেষে দেখি যে, ঐ বাজানার নাম morning Hymn :বা প্রাভাতিক স্তব। সেইরূপ আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য .সঙ্গীতজ্ঞ অনেকেও আমাদের ভয়রো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগরাগিণী শুনিয়া বলিয়াছেন যে, উহারা প্রভাতের ভাবব্যঞ্জক। পাশ্চত্যদিগের নৈশ সঙ্গীত শুনিলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা নৈশভাব সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। আমার বিশ্বাস, প্রাচ্য বা প্রতীচ্যবাসী যিনিই হউন, আমাদেরও পূরবী, ইমনকল্যাণ, বেহাগ প্রভৃতি রাগরাগিণী শুনিলে কেহই বলিতে পারিবেন না যে এগুলির দ্বারা তাঁহার মনে প্রভাতের

ভাব জাগিয়া উঠে। এই সকল রাগরাগিণী শ্রোতাগণকে সান্ধ্য ও নৈশভাবেরই স্রোতে নিঃসন্দেহ ভাসাইয়া লইয়া চলিবে। প্রতীচ্য সঙ্গীতেও শোপ্যাঁর (chopinর) "নৈশগীত" "nocturne" বা Gounodর serenade শুনিলে কাহারও মনে প্রভাতের উজ্জ্বল ভাব জাগিয়া উঠিবে না—নিশীথের একটা নীরব কোমলকরুণ ভাবই জাগিয়া উঠিবে। তাহার কারণ এই যে, মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ, এবং সকলেরই অন্তর্নিহিত সঙ্গীত মূলত একই ভিত্তির উপরে গ্রথিত। সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে করিতে মানবমাত্রেরই অন্তরে একটা উদাস-করুণভাব আনয়ন করে, তখন সেই সময়ে অথবা সেই সময়ের জন্য রচিত—প্রাচ্যই হউক বা প্রতীচ্যই হউক—গীতাদিতে যে ঐ উদাস করুণভাবেরই প্রাধান্য থাকিবে, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রকার গভীর অন্ধকার রাত্রির গম্ভীর ভাব যখন মানবমাত্রকেই আচ্ছন্ন করে, বলা বাহুল্য যে, সেই গভীর নিশীথে রচিত অথবা সেই সময়ের জন্য রচিত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতে একটা নৈশ গম্ভীর ভাবেরই ছায়া নিপতিত হইবে। সঙ্গীতপ্রকাশের আকারে প্রকারে ভেদ থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে মূলত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উভয় সঙ্গীতই এক সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান।

সমস্ত সঙ্গীতে একটা অসাম্প্রদায়িক ভাব অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই বিভিন্ন জাতি পরস্পরের দুঃখ বা হর্ষসূচক গান বাজনার ভিতরে দুঃখ বা হর্ষের অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে। কেবল তাহাই নহে, আমরা দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশীয় দুঃখ বা হর্ষসূচক সঙ্গীত রচনাতেও একই প্রকার ঢং আসিয়া পড়ে। সকলেই জানেন, এবং বাজনার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে যে, বীঠোবেনের 'বিষাদগীতি'র মূলভাব গভীর বিষাদ। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদ ব্যক্ত করিবার জন্য যে ঢং বা প্রণালী উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন, বীঠোবেন তাঁহার রচনাতে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন; বলা বাহুল্য, বাজনাটী শুনিলেই মন বিষাদের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি পিলুবারোঁয়া রাগিণীতে "আমার প্রাণের ব্যথা কারে জানাই" নামক একটী গান রচনা করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, এই রাগিণীর মূলভাব বিষাদ; এবং গানের পদ হইতেও বিষাদেরই ভাব যে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। বীঠোবেনের ঐ "বিষাদগীতি"র প্রারম্ভেই কয়েক "কলি" বা bar এর মধ্যেই সমস্ত বাজনাটীর মূলভিত্তি গাঁথা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ তাহারই বহির্ব্যঞ্জক অংশমাত্র। একদিন ঐ বাজনাটী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াই উপলব্ধি করিলাম যে, ঐ মূল অংশের সহিত পিলুবারোঁয়ার কত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। তখন ঐ "বিষাদগীতি" ও পিতৃদেবরচিত গীত তুলনা করিয়া দেখি যে "বিষাদগীতির" ঐ বহির্ব্যঞ্জক অংশ যে প্রণালীতে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে পিতৃদেবের গানও স্বভাবতই সেই প্রণালীতেই রচিত হইয়াছে—একই সুর নিম্নস্তর হইতে ক্রমশঃ যথাযথ উচ্চ স্তরে গিয়া চরমে পৌঁছিবার পর আবার নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। এস্থলে পিতৃদেবের উল্লেখ করাতে আমার যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে, আশা করি তাহা কেহই গ্রহণ করিবেন না। বীঠোবেন ও পিতৃদেব, উভয়ের কথা একসঙ্গে বলিয়া আমি দেখাইতে চাই যে, দেশের, কালের ও অবস্থার সুমহান ব্যবধান সত্ত্বেও উভয়ের রচনা-প্রণালীর মধ্যে সৌসাদৃশ্যের কারণ হইতেছে সঙ্গীতে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর অতীত এক সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্বের অস্তিত্ব। তবে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের প্রভেদ এইটুকু—যাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—যে, প্রাচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদ বা একস্বরত্বের প্রাধান্য—প্রত্যেক স্বরকে পৃথকভাবে ফুটাইয়া প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রত্যেক গান বা গতের মূল কেন্দ্র রাগরাগিণীকে ফুটাইবার চেষ্টা হয়; প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদ বা বহুলস্বরত্বের প্রাধান্য—একাধিক সম্বাদী স্বরকে একসঙ্গে ফুটাইয়া সঙ্গীতের মূলভিত্তি রাগরাগিণীকে অনেক স্থলে ঢাকিয়া ফেলিয়া বহিরঙ্গ স্বরসম্বাদকেই অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রতীচ্য সঙ্গীতে স্বরভেদের অপেক্ষাকৃত অবান্তর স্থান এবং স্বরসম্বাদের অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হইলেও সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণী পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। প্রাচ্যসঙ্গীতে দুএকটী ব্যতীত স্বরসম্বাদের নিদর্শন পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বরসম্বাদের ভিতরেও বিশেষ বিশেষ রাগরাগিণীর প্রকাশক স্বরবিন্যাস দৃষ্ট হয়। প্রতীচ্য যে কোন সঙ্গীতকে স্বরসম্বাদের দ্বারা যতই কেন আচ্ছন্ন করা হোক না, তাহার ভিতরে কোন-না-কোন রাগরাগিণী অন্তঃসলিল-ভাবে, গূঢ় ও প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান থাকিবেই। যেমন কোন সমাজে সংঘবদ্ধ ভাবের অভাব ঘটিলেও ব্যক্তিত্বের অভাব হয় না, এবং সংঘবদ্ধ ভাবের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য্যরূপে বর্ত্তমান থাকিবেই, ব্যক্তিত্বই যেরূপ সমাজের মূল তত্ত্বরূপে অন্তর্নিহিত, সেইরূপ সঙ্গীতেও স্বরসম্বাদের অভাব ঘটিলেও স্বরভেদব্যক্ত রাগরাগিণীর অভাব হইবে না, এবং স্বরসম্বাদের মধ্যেও রাগরাগিণীর অস্তিত্ব অপরিহার্য্য—রাগরাগিণীই সঙ্গীতের মূলতত্ত্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান। ইহা কেবল মতবাদ নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এই কারণেই আমরা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য

উভয় দেশীয় নৈশ সঙ্গীতেরই ভিত্তিরূপে কোন-না-কোন সান্ধ্য বা নৈশ রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসকে অবস্থিত দেখি। Chopinর nocturne গুলি সুপ্রসিদ্ধ। Beethoven এর Pathetique sonata তে যেমন আমরা পিলুবারোয়াঁ রাগিণীর অবস্থিতি দেখিলাম, তেমনি Chopinর দ্বিতীয় nocturneএ পূরবী, ছায়ানট ও ইমন-কল্যাণ রাগিণীগুলির ঠাট বা রূপ খুব সহজেই অনুভূত হয়। তাঁহার অন্যান্য নৈশসঙ্গীতেও খাম্বাজ, পূরবী, কেদারা প্রভৃতি রাগিণীর স্বরবিন্যাসের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রতীচ্য সঙ্গীতের ভিতরেও যেমন রাগরাগিণীর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নহে, সেইরূপ প্রাচ্য সঙ্গীতকে স্বরসম্বদ্ধ করাও অসম্ভব নহে।

রাগরাগিণী যে সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব, সঙ্গীতমাত্রেই তাহার অপরিহার্য্য অস্তিত্বই সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতে আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রকাশ দেখি; এবং স্বরভিন্ন বা একস্বর সঙ্গীতে আমরা একত্বকেই একমাত্র সাররূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি। প্রকৃতিতে যেমন আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের একটী বন্ধনসূত্র দেখি, স্বরসম্বদ্ধ সঙ্গীতেও সেইরূপ দেখি যে, নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূল রাগরাগিণীর একটী বন্ধন-সূত্র থাকিবেই। মূল রাগরাগিণীর বহিঃশরীর স্বরবিন্যাসের অভাব হইলে কোন্ স্বরের উপর স্বরসন্ধিই বা হইবে, আর কাহারই বা উপর স্বরসম্বাদ করা হইবে? কোন একটী শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর উপর অবলম্বিত না হইয়া কোন স্বরসম্বাদই দাঁড়াইতে পারে না। প্রাচ্য কোন রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসের কোন এক বা একাধিক স্বরকে স্বরসন্ধি প্রভৃতির সাহায্যে পল্লবিত বা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অনুবাদিত করিয়া তুলিলেই তাহাকে স্বরসম্বদ্ধ করা যাইতে পারে—আমরা তথাকথিত পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রাপ্ত হই; আর পাশ্চাত্য স্বরসম্বদ্ধ কোন গান বা গতের সারটুকু বাহির করিয়া লইলেই তাহার অন্তঃস্থিত শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীটুকু প্রাপ্ত হই। রাগরাগিণী হইল সঙ্গীতের মূল মন্ত্র, স্বরবিন্যাস হইল তাহার খাঁটি অর্থ, এবং স্বরসম্বাদ হইল তাহার অন্যতর লক্ষ্য বা টীকা। রাগরাগিণী সুব্যক্ত করিবার সহায় স্বরবিন্যাস ও তদনুষঙ্গী স্বরভেদের সহিত স্বরসম্বাদের এতই যোগ, উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে, স্বরভেদের পরিবর্ত্তে স্বরসম্বাদেরই উন্নতিসাধন Beethoven প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের লক্ষ্য হইলেও তাঁহারা স্বরসম্বাদের পরিধি যথেষ্ট প্রসারিত ও সমুন্নত করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভেদেরও প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতের ঋষিরা যেমন ধ্যানবলে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যাকে করতলন্যস্ত করিয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানকে মানবমাত্রের সকল জ্ঞানবিভাগেরই অন্তর্নিহিত কেন্দ্ররূপে প্রতীতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতের ঋষিমুনিরাই একান্ত সাধনার ফলে সঙ্গীতের সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব রাগরাগিণীর সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের আবিষ্কারই তাঁহাদের জগতকে বিশেষ দান। এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের অনুশীলন ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার সহায় এবং রাগরাগিণীর মধ্যে সমস্ত সঙ্গীতেরই সমাবেশ হইতে পারে, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা, যতপ্রকার উপায়ে সেই মূলতত্ত্ব রাগরাগিণীকে সুব্যক্ত করা যাইতে পারে, সেই সকল উপায়েরই উন্নতিসাধনে হৃদয়-মন অর্পণ করিয়াছিলেন; স্বরসম্বাদকে সঙ্গীতের মাত্র বহিরঙ্গরূপে প্রতীতি করিয়া তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ কোনই দৃষ্টি দেন নাই। ইহার বিপরীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা ঐ বহিরঙ্গ স্বরসম্বাদেরই উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে আমরা এই সুস্পষ্ট সত্যে উপনীত হইতেছি যে, স্বরসম্বাদও যেমন পাশ্চাত্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে, উহা মানবমাত্রেরই অন্তরে ভগবান কর্ত্তৃক নিহিত সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বেরই বহিরঙ্গ মাত্র, স্বরভেদপ্রধান স্বরবিন্যাসের দ্বারা প্রকাশিত রাগরাগিণীও সেইরূপ প্রাচ্যদিগের একচেটিয়া নিজস্ব নহে—উহা মানবমাত্রেরই অন্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে ভগবান কর্ত্তৃক লিখিত সঙ্গীতসম্বন্ধীয় সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব। স্বরভেদ ও স্বরসম্বাদ একই সঙ্গীতের সুমহান মুক্তির পথে সমুত্থিত হইবার দুইটী পক্ষ। সুতরাং স্বরসম্বাদের বা harmonyর দিকে ভারতীয় সঙ্গীতকে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিলে, তাহা যে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ-বিরোধী হইবে, অথবা তাহার ফলে ভারতীয় সঙ্গীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগরাগিণীর প্রাণ সমধিক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রাণঘাতী হইবে, অথবা তাহার ফলে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যে নিজের বৈশিষ্ট্য স্বরসম্বাদ হইতে বিচ্যুত হইবে, সে কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

বর্ত্তমান যুগে জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সঙ্গীত-বিভাগেও মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে, সামঞ্জস্য অবলম্বন করিতে হইবে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যথাসম্ভব মিলন সাধন করিতে হইবে। সঙ্গীতের

সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রকাশপ্রণালীর মধ্যে বিরোধবিবাদ বিদূরিত করিতে হইবে। সঙ্গীতের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে চাহিলে একদিকে যেমন স্বরভেদপ্রধান রাগরাগিণীর প্রয়োগ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে প্রসারিত করিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ স্বরসম্বাদপ্রধান প্রকাশপদ্ধতিকে প্রাচ্য সঙ্গীতে প্রবর্ত্তিত করিবার অবসর দিতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যাহা ভাল দেখিব, তাহা আমাদের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যাহা গ্রহণের উপযুক্ত, নকলনবিশের ন্যায় তাহা হুবহু নকল করিতে বলি না। তাহাকে আমাদের রাগরাগিণীর স্বরবিন্যাসের উপর দাঁড় করাইয়া দেশীয় ভাবধারার অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, পূজ্যপাদ পিতৃদেব, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞেরা অনেকগুলি বিদেশীয় সুরকে এই প্রকারে দেশীয় ভাবে অনুবাদ করিবার কার্য্যে বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন। বিদেশীয় আচার-ব্যবহার, বিজাতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের ব্যবস্থা অনেক সময়ে অশোভন ও ব্যর্থ হয়। কিন্তু বিদেশীয় বিজাতীয় হইলেও জ্ঞানের কোন বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে অশোভন ও ব্যর্থ হইবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে রোমক অংশ প্রবেশ করাইবার ফলে মঙ্গলই হইয়াছে, জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি ও প্রসারই হইয়াছে। সেইরূপ পাশ্চাত্যদিগের নিকটে সঙ্গীতবিষয়ক কোন কিছু গ্রহণ করিলে আমাদের লজ্জা পাইবার তো কোন কথাই নাই, বরঞ্চ তাহা আমাদের সজীবতারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। গণিতবিষয়ক সত্য যেমন সকল দেশেই সত্য—দুই আর দুইয়ে চার হয়, ইহা যেমন দেশ-কালনির্ব্বিশেষে সত্য, সেইরূপ সঙ্গীতবিষয়ক সত্যগুলিও দেশকালনির্ব্বিশেষে সত্য—সা ও রে একসঙ্গে বাজাইলে এদেশেও সম্বাদী হইবে না, ইংলণ্ডেও সম্বাদী হইবে না। সজীব পাশ্চাত্যদেশের সঙ্গীতজ্ঞেরা আমাদের রাগরাগিণী অবলম্বনে সঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জাগরণের দিনে আমরা যদি অন্যজাতির ভাল বিষয় গ্রহণ করিতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকি, তবে আমাদিগকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের রাজ্য হারাইতে হইবে। পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যসঙ্গীতের মনোমত ভাল অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, আর আমরা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কোন অংশ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেখিলেও কি অস্পৃশ্য বলিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিব? তাই বলি, সঙ্গীত বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পথে যাঁহারা পথপ্রদর্শক হইবেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আর, সঙ্গীতবিষয়ে প্রাচীনপন্থীরা—যাঁহারা এই প্রকার মিলনের বিরোধী—তাঁহারাও আমাদের নমস্য, তাঁহাদেরও উদ্দেশে আমাদের কৃতজ্ঞতা সমুত্থিত হইতেছে। তাঁহারাই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য আবহমান কাল রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; জাতীয় অবনতির সঙ্গে আমাদের অনেক ভাল জিনিস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনপন্থীরাই ভারতীয় সঙ্গীতের নির্ম্মল ধারাকে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। শত শত রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে আমরা হীরকসদৃশ ভাস্বর নানা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাচতুল্য নিষ্প্রভ অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া হর্ষচিত্তে বিচরণ করিতেছি, আনন্দে বিভোর হইয়া আছি। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে প্রাচীনপন্থীরা প্রকৃত জহুরির ন্যায় ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়া তাহাকে অবিকৃত আকারে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই সেই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজও আমরা ধ্রুপদ প্রভৃতি উচ্চ দরের অনুপম সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইবার অবসর লাভ করিতেছি, কেবল টপ্পাজাতীয় সঙ্গীতের মোহে ডুবিয়া যাই নাই। বর্ত্তমান যুগে বিরোধবিবাদ ভুলিয়া গিয়া, সাম্প্রদায়িকতার জেদ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পদ্ধতিকে যথাসামঞ্জস্য গ্রহণ করিলে সঙ্গীতরাজ্যেও ভারত যে পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপসংহারে যে গীতপতি পরম দেবতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানবমাত্রেরই অন্তরে সঙ্গীতের নির্ঝরের আকারে তাঁহার স্নেহপ্রেম ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং যিনি আমাদের অন্তরে সঙ্গীতের অসাম্প্রদায়িক ভাব উপলব্ধি করিতে দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতকে মিলনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার সুমহান বাণী প্রেরণ করিতেছেন, সকল সম্প্রদায়ের নমস্য, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের একমাত্র আকার সেই পরমেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি।*

৺ চিত্তরঞ্জন দাশ।

সর্ব্বজন পরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ আর নাই। বিগত ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দার্জ্জিলিং শৈলে তাঁহার দেহপাত হইয়াছে। রাজনৈতিক গগনের যে জ্যোতিষ্ক পাত হইয়া গেল, জানি না সেস্থান আর পূর্ণ হইবে কি না। এ দুর্ভাগ্য কেবল বঙ্গের নহে, সমস্ত ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিল। স্বাদেশিক আন্দো-

* ভারতবর্ষ—১৩৩২ আষাঢ়-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

লন বুঝি শিথিল হইয়া পড়িল। ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিভার জ্বলন্ত আলোক, অধ্যবসায়ের নিরুপম ছবি অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধি তাঁহার সহধর্ম্মী বিপুল বীর্য্যবান একনিষ্ঠ ভক্ত শিষ্যকে হারাইয়া আজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন। নেতা সহৃদয় বন্ধু ও পথ-প্রদর্শককে দেখিতে না পাইয়া ভারতের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার উঠিয়াছে—অশ্রুজল ঝরিতেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিতের মুখে একই কথা—সি, আর দাশ আর জীবিত নাই। শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায়, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি সকলেই ভগ্নস্বাস্থ্য। প্রকৃত কর্ম্মীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল। ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ ঘোর ঘনঘটাছন্ন। আশার প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। জানি না, ভগবৎকৃপা কাহার ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়া আবার সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে।

শ্রীযুক্ত সি, আর দাশ ৫৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। বিপুল পরিশ্রমে, মুক্তির বার্ত্তা ঘোষণার জন্য দেশ-দেশান্তর ভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবার পরে ত্যাগের ভিতরে তিনি আপনাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কারাবাসও তাঁহাকে বরণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রেরও ঐরূপ সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। অনেক বন্ধুবান্ধবকেও তিনি কারাগৃহে বিদায় দান করিয়াছিলেন। চারিদিকে বিপুল ও অসংখ্য বাধার সহিত তাঁহাকে অমিতবলে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। রাজশক্তির অদম্য শক্তিকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহাকে সমস্ত বল নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। তাহার উপর আপনার মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য তাঁহাকে অশেষ প্রকার আয়াস সহ্য করিতে হইয়াছে। কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁহার সঙ্গী, পরিণীতা ভার্য্যা আদর্শস্থানীয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী তাঁহার সান্ত্বনাদাত্রী। সত্যের বলে তিনি বলীয়ান, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত যাহা তিনি কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহারই সমুজ্জ্বল প্রভা তাঁ।কে উৎসাহ দান করিত, তাঁহার অন্তর হইতে সমস্ত নিরাশা বিতাড়িত করিয়া দিত। তাই তিনি অচঞ্চল ও অটলভাবে স্বস্থানে স্থির ধীর ও গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।

জীবনের এক অধ্যায়ে ঋণের দারুণ চাপে তাঁহাকে আদালতের সাহায্যে দেউলিয়া হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সত্য যাঁহার জীবনের ব্রত, দেশ ও জনসেবা যাঁহার অন্যতর লক্ষ্য, তিনি কলঙ্ক বহন করিবেন কেন? যখন সৌভাগ্যের দিন আসিল, আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত ঋণ একে একে পরিশোধ করিয়া দিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি আইনের ফাঁকে মহাজনসকলকে বঞ্চনা করিতে পারিতেন। কিন্তু মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া যিনি দেশের কল্যাণসাধনে অবতীর্ণ হইবেন, সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া দীনভাবে বৈরাগ্যের বসনে ত্যাগের কবচ পরিধান করিয়া তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। তাই দেখিতে পাই স্বার্থের লালসায় মান-যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভারতের চিরন্তন ভাব সেই ত্যাগের মূর্ত্তি তাঁহাকে সম্পূর্ণই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অসমাপ্ত সাধনার ভিতরে সাহিত্যিক কবি, চিন্তাশীল লেখক, অক্লান্ত কর্ম্মী, বিনয়ী চিত্তরঞ্জন চারিদিকে হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি যে নব চেতনার সৃষ্টি করিয়া গেলেন, নব আলোকের আগমন-পথ ঈষৎ প্রমুক্ত করিয়া গেলেন, কর্ম্মঠ জীবনের যে সুস্পষ্ট ছবি সকলের সমক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলেন, তাঁহার দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মাদনা, সে চৈতন্য সে আদর্শ যেন আমরা নিজের দোষে হারাইয়া না ফেলি। তিনি যে আহ্বান রাখিয়া গেলেন তাহাতে চির উদ্বুদ্ধ থাকিয়া যেন তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া স্বদেশের মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া তুলি। শোকসন্তপ্তা পত্নী বাসন্তী দেবীকে ও চিররঞ্জনকে আর কি বলিব? তাঁহারা ভাগ্যবতী ও ভাগ্যবান যে তাঁহারা দেশবন্ধুর পত্নী ও পুত্র হইতে পারিয়াছিলেন। যিনি আপনার সুশীতল ক্রোড়ে দেশবন্ধুকে আশ্রয় দান করিলেন, তিনি তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

শোভাযাত্রা। শবদেহকে লইয়া যে উৎসব হইতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বে ছিল না। গত বর্ষে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি মহানুভব আশুতোষের বিদায় আয়োজনে; আবার এ বৎসর দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের অন্তিম বিদায়দানে হিন্দু-মুসলমান প্রমুখ যে সকল জাতির সুবিরাট আয়োজন দেখিলাম—ভাষা নাই উহার গুরুত্ব প্রকাশ করিতে পারি। ৪ঠা আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে চিত্তরঞ্জনের মৃত-দেহ শিয়ালদহে পৌছিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভীষণ জনতা চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শোকসম্বাদে এরূপ জনসমাগম ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম। কাহার সাধ্য তাহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে? যে যে পথ ধরিয়া পুষ্পাচ্ছাদিত মৃত শরীর বাহিত হইয়াছিল, তাহার উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখে পশ্চাতে ক্রোশব্যাপী জনসমুদ্র। প্রতি ছাদের উপরে প্রতি গবাক্ষের অন্তরালে অগণ্য কুলমহিলাগণ সোদ্‌গ্রীব হইয়া সজল নেত্রে অবস্থিত। শোভাযাত্রার পরিপূর্ণ আয়োজন অথচ সকলই স্বতঃ-

প্রবৃত্ত। কেহ বা পতাকা লইয়া ছুটিয়াছে, কেহ বা পাখা বিলাইতেছে, কেহ বা ব্যজন করিতেছে, বারিবাহী শকট হইতে সুশীতল পানীয় জল ও সরবৎ বিতরিত হইতেছে, স্তূপীকৃত মাটীর গেলাস বক্ষে লইয়া দ্রুতগামী লরি ছুটিতেছে। মৃতদেহের উপরে গৃহ-ছাদ ও গবাক্ষ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে। শ্মশান ঘাটের সান্নিধ্যে সামিয়ানা খাটাইয়া জলসত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই যে মহোৎসব দেখিলাম—তাহাতে কোলাহল নাই, চাপল্য নাই; কেবলই হাহাকার, কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস, কেবলই অশ্রু-বিসর্জ্জন। চৌরঙ্গীরোড অতিক্রম করিবার সময় সহৃদয় ইংরাজগণ মৃতের প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশে কিছুমাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। বেলা দুইটার পরে চিত্তরঞ্জনের নশ্বর শরীর অগণিত বাহক কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যখন চিতার নিকট আনীত হইল, হা-হুতাশ আরও বাড়িয়া উঠিল। লোলজিহ্ব অগ্নি অগুরু-চন্দনের ও ঘৃতের আহুতি পাইয়া দেশবন্ধুর পার্থিব ভাগ ভস্ম করিয়া দিল বটে—কিন্তু যাহা ভস্ম হইবার নহে, তাহা স্বদেশগঠনের এবং ঐক্য ও মিলনের দিকে হিন্দুমুসলমানগণকে যে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দিল তাহা সুনিশ্চিত। এই মরণোৎসব ব্যর্থ না হইয়া, নবপ্রেরণায় নবজাগরণে সকলকে আরও জাগ্রত করিয়া তুলুক।

আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন—সুরের নীচে হসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন—সুরের মাথায় রেফ্।

২। কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ; কড়ি ম=হ্ম; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ।

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক-একটী দাঁড়ি। ১, ২´, ৩, ০ ইত্যাদি তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। যে অঙ্কের মাথায় রেফ্ তাহাই সম্।

৪। তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "আই" এই ইংরাজী অক্ষরটী বসে; আরম্ভ ও শেষে দুই "আই" বসে।

৫। একমাত্রা=।। অর্দ্ধমাত্রা=ঃ। দুইটী অর্দ্ধমাত্রা, যথা 'সরা'। চারিটি সিকিমাত্রা, যথা "সরগমা"। দুইটী সিকিমাত্রা, যথা সরঃ। একটী অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটী সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা সঃ গরঃ। একটী দেড়মাত্রা ও একটী অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা, যথা রাঃ গঃ।

৬। কোন আসল সুরের পূর্ব্বে যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক সুর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই সুরটী ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল সুরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, সরা—গরা। গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ স্পর্শমাত্রিক সুর লাগিয়া থাকে। আসল সুরের পরে কখন কখন অন্য সুরের ঈষৎ রেশ লাগে; তখন ঐ সুর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত হয়, যথা রাস।

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন্-বর্জ্জিত হইলে, এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। সুরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৮। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি। হয় এইখানে একেবারে থামিবে; নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া "আই" বসে। কোন কলির শেষে II এই যুগল "আই" দেখিলেই আস্থায়ীর যেখানে এইরূপ যুগল "আই" আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। পৌনরুক্তির চিহ্ন, এই { } গুম্ফ বন্ধনী; এবং পৌনরুক্তিকালে কতকগুলি সুর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন, এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথা { সা রা গা (মা পা) ধা না }

১১। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্তিকালে কোন সুরের পরিবর্ত্তন হইলে, শিরোদেশে ব্র্যাকেটের মধ্যে পরিবর্ত্তিত সুরগুলি স্থাপিত হয়। যথা,—

[রা গা মা]
সা রা গা।

গ্রন্থ-পরিচয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতোপনিষৎ—প্রথমোঽধ্যায়ঃ—শ্রীক্ষীরোদ নারায়ণ ভূঁঞা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীযুত ভূঁঞা মহাশয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একজন যথার্থ ভক্ত ও অনুরাগী অধ্যেতা। তিনি ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম জন্য বহু বৎসর যাবৎ নিয়মিতভাবে গীতা অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু উহার বহু ব্যাখ্যাতৃপুরুষের "নানা অর্থ" দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই ব্যথিত হইতেন। অবশেষে সমগ্র মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ করিয়া তাঁহার সংশয় অপনোদিত হয় এবং তিনি গীতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। সমগ্র মহাভারত ও পুরাণের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া গীতার যে অর্থ তাঁহার অন্তরে অনুভূত হইয়াছে উহা তাঁহার স্বরচিত কৃষ্ণভাবিনী টীকায় ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত কৃষ্ণভাবিনী টীকাসম্বলিত গীতার এই নূতন সংস্করণ তিনি এক-এক অধ্যায় করিয়া খণ্ড খণ্ড প্রকাশ করিতেছেন। এই টীকার বিশেষত্ব এই যে, শ্লোকান্তর্গত এক-একটী শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং কোথাও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া সহজ সরল শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে সমগ্র শ্লোকার্থের মধ্যে একেবারে তলাইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীযুত ভূঁঞা মহাশয়ের মতে—"স্বধর্ম্ম পালন ও ভগবদ্‌ভক্তি একত্রে করাই গীতার উপদেশের মর্ম্ম"।

ডিমাই ৮পেজী আকারে ৸৶০+৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; কাগজ ভাল।

ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত। শ্রীবঙ্কবিহারী কর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

ঢাকা জেলায় মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত ভাটপাড়া একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার গুপ্তবংশ চিরদিনই বিশেষ সম্মানার্হ। ভক্ত কালীনারায়ণ এই গুপ্তবংশের বংশধর এবং ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইনি স্বকীয় পুণ্য-প্রভাবে একটী গৌরবময় সুবৃহৎ সম্পন্ন পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। খ্যাতনামা স্বনামধন্য সার কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতি ইহাঁরই সুযোগ্য পুত্র। ইনি প্রথমত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তারপর ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সে ইতিহাস বড়ই আশ্চর্য্যজনক। ভক্তজীবনীরচনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীবঙ্কবিহারী কর মহাশয় নাতিদীর্ঘ নয়টী পরিচ্ছেদে ভক্ত মহাত্মার সে জীবনেতিহাস আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। সেই প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের নব অভ্যুদয় যুগে ৺অক্ষয় কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি', ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'বক্তৃতা', 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতি সত্যধর্ম্ম প্রচারে কত অধিক সহায়তা করিয়াছিল তাহা এই জীবনী পাঠে আমরা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমরা এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত ও ভক্তসাহচর্য্য-লাভে ধন্য হইয়াছি।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ১৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পাঁচখানি ফটোচিত্রে মণ্ডিত। ছাপা ও কাগজ ভাল।

ভাবসঙ্গীত ও ভাবকথা—কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত। ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা হইতে শ্রীবরদা কান্ত বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

উপরে যে মহাত্মার জীবন-বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত। এই সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থখানির এরূপ নামকরণের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে—"না থাকার নাম অভাব, থাকার নাম ভাব। থাকার ভাবই ভাবসংগীতের ভাব। এইভাবে ইহার ভাবসংগীত নাম হইল।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্রহ্মসঙ্গীতই; অধিকন্তু সঙ্গীতগুলি গ্রাম্য সুরে ও ভাষায় রচিত হওয়ায় পল্লীবাসী জনসাধারণের চিত্ত ইহাতে সহজেই আকৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। সঙ্গীতগুলিতে রচয়িতার যে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই মনোরম। অধিকন্তু এবারকার এই সপ্তম সংস্করণের গোড়ায় শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের উপযুক্তা কন্যা ৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ "পিতৃ-স্মৃতি" সংযুক্ত করিয়া "পিতৃতর্পণ" সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার এই রচনা অতি মনোরম হইয়াছে; একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ছাপা ও কাগজ ভাল। রয়াল ১৬ পেজী আকারে ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মহিম্নঃস্তোত্রম্।—শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

সংস্কৃতভাষায় স্তোত্রসাহিত্যের মধ্যে মহিম্নঃস্তোত্রের বিশেষ খ্যাতি আছে। এই স্তোত্রটী ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র সাগ্রহে নিত্য পঠিত হইয়া থাকে; অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার একটীও নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। সুখের বিষয়, সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহাশয় ইহার যে একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, উহা দ্বারা দেশের এই দীর্ঘ দিনের অভাব আজ বিদূরিত হইল। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণটী যাঁহার

চোখে পড়িবে তিনিই ইহার অন্তঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া পারিবেন না। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় প্রথমে স্তোত্রের মূল শ্লোক, তন্নিম্নে পদচ্ছেদ, তাহার পর উহার এক বিশদ ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা ৩২ খানি হস্তলিখিত টীকার সাহায্যে মল্লিনাথের পদ্ধতি অনুসরণে করা হইয়াছে। ব্যাখ্যার পর মূল শ্লোকের সরল বঙ্গানুবাদ, অবশেষে বিস্তৃত বিবৃতি আছে; এই বিবৃতিতে শ্লোকের ভাব, তাৎপর্য্য ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় একজন যথার্থ পণ্ডিত। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া মহিম্নঃস্তোত্রে স্বকীয় জ্ঞানলাভের জন্য অনুসন্ধিৎসার সহিত যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই আজ পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে একটী কম সুসংবাদ নহে। তাহা ছাড়া দ্বাদশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি উক্ত স্তোত্র সম্বন্ধে যে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন সুসঙ্গত তেমনই পণ্ডিতজনসুলভ হইয়াছে। তাঁহার এই সুন্দর আলোচনাটী আমরা ১৮৪৫ শকের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ উহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

আমাদের মনে হয়, সমগ্র শ্লোকটীর একটী স্বতন্ত্র অন্বয় থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থগ্রহের অধিকতর সুবিধা হইত।

ডবল ক্রাউন আকারে ২২+১৫৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ ভাল। শ্যামবাজার ব্রিজ রোড সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎমন্দিরে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

তন্ত্রী।—সদানন্দ ওরফে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস প্রণীত। কলিকাতা ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

'তন্ত্রী'—হিন্দী ও বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটী ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্গীতের সমষ্টি। ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রন্থকারের এক উপযুক্ত বয়স্ক পুত্রের চিতাভস্ম হইতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত গীতশতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়, কোন সঙ্গীতেই আমরা তাঁহার শোকব্যাকুল দুঃখিত চিত্তের পরিচয় পাইলাম না—আগাগোড়াই তিনি সদানন্দ। ভগবৎপ্রেমের রাজটীকা কপালে পরিয়া যিনি বিশ্বজগৎকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন, কীট-পতঙ্গ-তৃণ-তরুতে যাঁহার আত্মীয়-বোধ জাগ্রত হইয়াছে, পুত্রবিয়োগবেদনায় কি তিনি বিমূঢ় হইতে পারেন? আমরা দেখিয়াছি, তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ যোগে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটী সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম অটল বিশ্বাস ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভক্তসুলভ বৈরাগ্য ও দীনতায় মণ্ডিত হইয়া শোভনশ্রী ধারণ করিয়াছে।

সঙ্গীতগুলির ভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। গত ১৮৪৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমরা ইহাঁর কয়েকটী সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছিলাম; আশা করি, পাঠকগণ তাহার রস উপভোগ করিয়া থাকিবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক সঙ্গীততত্ত্বার্ণব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গানগুলিতে সুর ও তাল যোজনা করিয়াছেন। রয়াল ১৬ পেজী আকারে ১৲+৯৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুখপত্রে গ্রন্থকারের একখানি ফটো-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।—ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। মূল্য ১৲ টাকা।

বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশ-গ্রন্থ ত্রিপিটকে নির্ব্বাণ-হেতুভূত 'সম্যক্‌দৃষ্টি' প্রভৃতি যে আটটী উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, উহারই নাম "আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ"। উহার মূল মাগধী ভাষায় লিপিবদ্ধ। গ্রন্থকার সেই মূল মাগধী ভাষা হইতে বচনসকল উদ্ধৃত করিয়া তন্নিম্নে উহাদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং 'মার্গাঙ্গ-দীপনী' নামক স্বরচিত এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারা দার্শনিক তত্ত্বালোচনা সহকারে বাঙ্গালা ভাষায় মূল বিষয়টীর তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন। বিষয়গুরুত্বে ও পারিভাষিক শব্দের বাহুল্যে ব্যাখ্যানটী সাধারণের পক্ষে তত সুখবোধ্য না হইলেও আমরা গ্রন্থকারের প্রশংসা না করিয়া পারি না; কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এজাতীয় গ্রন্থের একান্তই অভাব ছিল। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রচার দ্বারা সেই অভাব মোচন করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহোপকার সাধন করিলেন।

'আনাপান-দীপনী' নামক 'আনাপান-সতির' একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগ-দর্শনের সহিত ইহার অনেক মিল দেখা যায়। ইহা ছাড়া গ্রন্থকার ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় গ্রন্থোক্ত মূল বিষয়গুলির একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারে ১।৹+১৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ মন্দ নয়।

নিবেদন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইলে তাঁহাকে সেই বৎসরের ১ম সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৶৹ আনা ; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৹ চারি আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। অসমর্থ, ছাত্র এবং মহিলাদের জন্য বার্ষিক মূল্য ২৶৹।

৩। প্রতি মাসের সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ প্রতি মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে তদন্ত করিবেন ; না পাইলে ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিবেন। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাস অতীত হইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না।

৪। বিনামূল্যে নমুনা-স্বরূপ পত্রিকা দেওয়া হয় না। তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয়। অতিরিক্ত খরচ ।৹ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। অল্পদিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করাই সুবিধা।

লেখকগণের প্রতি।

৭। লেখকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

৮। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে রচনা মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফের দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি।

৯। বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসে মাসে অগ্রিম দেয়।

১০। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। শেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর পনেরো দিনের মধ্যে ব্লক ফেরত না লইলে উহা হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১১। অশ্লীল প্রভৃতি বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বর্জ্জাইস অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপি না। ছাপিতে হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি।

১২। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণতঃ স্মলপাইকায় ছাপা হয়। হেডিং প্রভৃতিতে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

১৩। বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য :—পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৲ ; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪॥৹ ; সিকি পৃষ্ঠা ২॥৹ ; সিকি কলম ১॥৹ টাকা।

১৪। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে বা দীর্ঘকাল প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্র লিখিলে জানান হয়।

১৫। পত্রিকার মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

১৬। পত্রিকা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাইবেন।

১৭। পত্রিকার বহুল প্রচারের জন্য এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক। আমাদের নিযুক্ত এজেণ্টগণ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাজনক স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সাক্ষাতে তাহার বিবরণ জানিতে পারিবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।



প্রিন্স দ্বারিকনাথ ঠাকুর।
(বিলাতে অবস্থানকালে)



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(যৌবনে)



সারদা দেবী



শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(যৌবনে)

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সৌজন্যে)

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮৪ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬১ অঞ্জলি। পর্জন্য-দেব—দেবতা।

১। প্রচণ্ড ঝড় উঠিতেছে। পশ্চিমদিক হইতে হুহুস্বরে মেঘগুলা যেন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। হে ভয়ত্রাতা! আমরা বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছি। পিতা যেমন পুত্রকে বিপদ-আপদ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন, তুমিও আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর।

২। প্রভু! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইও না। তুমি আমাদের নিকটে এসো। মেঘের ভিতরে তুমি আছ। প্রভঞ্জন বায়ুর মধ্যেও তুমি আছ। তোমারই ভয়ে মেঘ সঞ্চলিত হইতেছে, এবং তোমারই ভয়ে প্রভঞ্জন বায়ু বেগে ধাবিত হইতেছে। আমরা তোমাকে ব্যাকুল প্রাণে আকুল হৃদয়ে ডাকিতেছি। আমাদের উপরে এই ঝড়ের আঘাত পড়িতে দিও না।

৩। নূতন মেঘের স্নেহ নূতন জলধারারূপে নামিয়া পৃথিবীকে সিক্ত করিয়া দিল। গাছপালা নবতর শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। পাখীরা নিজ নিজ দেহ হইতে জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া আনন্দ-ধ্বনিতে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। ইন্দ্রধনু বিজয়ী বন্ধু মেঘের বিজয় ঘোষণার জন্য পূর্ব্বদিকে বিচিত্রবর্ণে সুরঞ্জিত বিরাট বিজয়-তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সূর্য্যের অস্তাচলে যাইবার সময় আসিয়াছে। ডুবি-ডুবি করিয়াও সূর্য্য অপরাহ্ণের এই সমস্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতেছে। আমাদের নয়নে, হে সুন্দর! দিব্যদৃষ্টি দাও। আমরাও এই সৌন্দর্য্যের ভিতর তোমাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাই।

৪। এই মেঘ এই ঝড় আসিয়া যেমন মৃতপ্রায় ধরণীর অন্তরে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, শুষ্কপ্রায় জীবজন্তুর অন্তরে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছে; তুমিও সেইরূপ তোমার অমৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে নির্ভয় কর এবং মৃত্যুকে পরাজিত করিবার শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর।

৫। দুঃখের আঘাতে ব্যথিত হইয়া, অজ্ঞানবশত ভয়ে ভীত হইয়া আমরা যেন তোমাকে কখনও না ভুলি। তোমাকে আমাদের অন্তরের পূজা অর্পণ করিতে কখনও যেন পশ্চাৎপদ না হই। হে অমৃতপুরুষ! হে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষ! তুমি আমাদিগকে বারেক স্পর্শ কর, আমরাও তোমার পবিত্র স্পর্শে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া যাই।

৬। বাহিরের প্রবল ঝড় যেমন আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, আমাদের অন্তরে প্রবল বিষয়কামনা তেমনই আমাদিগকে আকুল করিতেছে। বায়ুতাড়িত রবারের গোলার মত আমরা বিষয়বাসনা কর্ত্তৃক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তাড়িত হইতেছি। বিষয়বাসনার সঙ্গে ভয়ভাবনা সকলই বর্দ্ধিত হইয়া

আমাদিগকে বড়ই পীড়া দিতেছে। তোমার শরণাগত হইতেছি। তুমি আমাদিগকে বাসনার হস্ত হইতে রক্ষা কর। আমাদিগকে সুখসৌভাগ্য প্রদান কর। মৃত্যু এবং মৃত্যুর সহচর অনুচর নানাবিধ ভয়ভাবনাকে অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান কর।

৭। তোমার স্নেহপ্রেমই বাহিরে বারিধারারূপে বর্ষিত হইয়া শুষ্ক তরুকে সঞ্জীবিত করে, কুসুমভারে পরিপূর্ণ করে এবং মরুভূমির মধ্যে প্রস্তরেরও ভিতর হইতে সুপেয় জলের শতেক উৎস খুলিয়া দিয়া পথিকদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করে। তোমার স্নেহপ্রেমই অন্তরে অমৃতধারার আকারে নামিয়া আমাদিগকে তোমার সঙ্গে সমধর্ম্মী করিয়া তুলে।

৮। কালো মেঘের ভিতর হইতে শুভ্র বিদ্যুৎ প্রকাশ হইয়া যেমন সমুদয় আকাশকে আলোকিত ও উজ্জ্বল করে, সেইরূপ তুমিও আমাদের কলুষাবৃত হৃদয়মন ভেদ করিয়া আমাদের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ কর; তোমার বিমল শুভ্র জ্যোতিতে আমাদের আত্মা আলোকিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

৯। তোমার স্নেহপ্রেম নিত্যকাল প্রতি মুহূর্ত্তে অজস্রধারে আমাদের মস্তকে ঝরিতেছে। কিন্তু পাপতাপের মেঘ আসিয়া যখন আমাদের হৃদয়মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, দুঃখকষ্টের ঝঞ্ঝা যখন বায়ুতাড়িত গোলকের মত আমাদিগকে লইয়া খেলা করিতে থাকে, তখনই তুমি জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে সেই অন্ধকার মেঘ অপসারিত কর এবং দুঃখকষ্টের ঝড়ের বাতাসে চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া দাও! তখনই তোমার স্নেহপ্রেম প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি এবং অবাক হইয়া যাই।

১০। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের প্রকাশে যখন চক্ষু ঝলসিয়া যায়; বজ্রের কড়কড় গর্জ্জনে যখন আকাশ বিদীর্ণ হইতে থাকে; ঝড়ের প্রবল বেগে যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটিত হইতে থাকে, গৃহাদি কম্পিত হয়; অবিরাম বারিবর্ষণের কারণে ধরণী যখন ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করে, তখন হে প্রভু! আমরা ভয়ে ত্রাসে কম্পিতচিত্ত হইয়া তোমারই শরণাগত হই।

১১। হে দেবদেব! তোমারই শাসনে যথাসময়ে আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ম্মল প্রসন্ন ভাব ধারণ করে। তোমারই শাসনে ঝড়ঝটিকা কোথায় চলিয়া যায় এবং সুনির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাদের অন্তরে শান্তি প্রদান করে। তোমারই শাসনে পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী নদীসকল প্রসন্নভাব ধারণ করিয়া আমাদের ভয়ত্রাস বিদূরিত করে। বিশ্বজগতকে নবজীবনে সঞ্জীবিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠি।

১২। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের শরীরকে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ কর। তুমি আমাদের মনকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমুজ্জ্বল কর। তুমি আমাদের আত্মাকে ধর্ম্মভাবে সমুন্নত কর। আমরা যেন নিত্য উপলব্ধি করি যে তুমি আমাদের পিতামাতা এবং আমরা তোমার সন্তান। এইটী উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন সমস্ত দুঃখশোক বিপদ আপদের মধ্যেও অটল ও নির্ভয় চিত্তে দাঁড়াইতে পারি।

১৩। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, সকল জ্ঞানের আকর। তুমিই আমাদের পথপ্রদর্শক নেতা। তুমিই আমাদের পরম সখা ও সুহৃৎ। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি।

১৪। আমরা তোমার মহিমা সর্ব্বত্র প্রচার করিব, তুমি আমাদের রসনাগ্রে আবির্ভূত হও। আমরা তোমার নামে অঞ্জলি রচনা করিব, তুমি আমাদের লেখনীর উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

১৫। আমরা তোমার চরণে যে সমস্ত অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি, সেই সমস্ত অঞ্জলির ফুলগুলি হৃদয়ের প্রশস্ত উপবন হইতে বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর। আমাদের চিত্তকাননে আরও বিচিত্র ফুল ফুটিয়া উঠুক।

৬২ অঞ্জলি। প্রাণং দেবতা।

১। হে প্রাণস্বরূপ! তোমার অসীম প্রাণ হইতে একবিন্দু প্রাণ এই বিশ্বজগতে তুমি নিক্ষেপ করিয়াছ। তাহা দ্বারাই এই বিশ্বজগত প্রাণে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরাও তোমার সেই প্রাণবিন্দু হইতে প্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছি। তুমি আমাদের প্রাণে অধিষ্ঠিত হও। আমরা তোমাকে পূজা করি।

২। তোমার বজ্রদণ্ড অধর্ম্মের বিনাশের জন্য

প্রযুক্ত হউক। তোমার বজ্রদণ্ড অশ্রদ্ধাবানদিগকে তোমার পথে ফিরাইয়া আনুক। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা যেন একমাত্র তোমাকেই সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিয়া পূজা করি। তোমার স্থান যেন ছদ্মবেশে আসিয়া কোন মনুষ্য, কোন দেবতা, কোন পদার্থ বা কোন শক্তি অধিকার করিতে না পারে।

৩। তুমিই একমাত্র ধ্রুব। তুমিই একমাত্র সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা। আমরা কত সময়ে ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কণ্টকাবৃত পথে চলিয়া আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হই। তোমার নিকটে যোড়করে এই প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগকে সেই কণ্টকময় পথ হইতে ফিরাইয়া আন এবং তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর।

৪। আমরা যখন তোমার আদেশের বিপরীতে চলি, তখন আমাদিগকে, হে পিতা, দণ্ড দিও, কিন্তু বিনাশ করিও না। আমাদের অন্তরে বল দাও, যাহাতে আমরা তোমার শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারি।

৫। হে পবিত্রস্বরূপ! তোমার আগমনের সম্বাদ পাইয়া অন্ধকারের সহচর অনুচরসকল কম্পিতচিত্তে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে। তোমার বিমল জ্যোতির অরুণ আভা দেখিতে পাইয়া তাহারা চারিদিকে দ্রুতপদে পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতেছে। হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমার জ্যোতিতে আমাদের হৃদয়গুহা উদ্ভাসিত কর।

৬। তোমার পুণ্যরথ তুমি আমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছ। সেই রথে আরোহণ করিয়া তোমার সমীপে উপস্থিত হইবার বর প্রদান কর। যাহারা পাপে ডুবিয়া তোমা হইতে দূরে যাইবার ইচ্ছা করিতেছে, আশীর্ব্বাদ কর, তাহাদিগকেও যেন অগ্নিসংযোগে সুবর্ণের ন্যায় তোমার নামের তেজে পরিশুদ্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।

৭। হে রুদ্র! তোমার রুদ্রমুখ সংহরণ কর। আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি। আমাদের সন্তানেরা যেন এমন কোন কার্য্য না করে, যাহাতে তোমার রুদ্রমুখ দেখিতে হয়। তোমার প্রসন্নমুখ আমাদিগকে দেখাও, যাহাতে আমাদের ভয়ভীত চিত্ত শান্তি লাভ করে।

৮। আমরা সর্ব্বদাই যেন শুভকর্ম্মে নিরত থাকি। আমাদের রিপুগণ যেন ইন্ধনের অভাবে অগ্নির ন্যায় বলহীন হইয়া পড়ে। রিপুগণের পীড়নে আমরা বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছি। তুমি আমাদের সহায় হইয়া তাহাদের সহিত সংগ্রামে আমাদিগকে বিজয়ী কর।

৯। হে দেবদেব! তুমিই সকল জ্ঞানের আকর। তুমিই সকল যজ্ঞের অধীশ্বর। তুমি আমাদিগকে তোমার জ্ঞানের কণামাত্র প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমার বিশ্বজগতের আশ্চর্য্য কৌশলসকল অবগত হইয়া ধন্য হই। তুমি আমাদিগকে সকল শুভকর্ম্মের যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত কর, যাহাতে আমরা তোমার বিতরিত অন্নজল লাভ করিয়া পুষ্টি তুষ্টি ও শ্রী লাভ করি।

১০। হে সুন্দর! তুমি তোমার অতুল সৌন্দর্য্যে এই বিশ্বজগত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। যতই সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করি, ততই তাহাতে ডুবিয়া যাই। তোমার সৌন্দর্য্যের অন্ত পাই না। সেই সৌন্দর্য্য ধারণা করিতে গিয়া হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া যায়। আমার দেহমন তোমার জ্ঞান, তোমার সৌন্দর্য্য ধারণা করিতে না পারিয়া মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিতেছে—অবশ হইয়া পড়িতেছে। প্রভু! যতটুকু ধারণা করিতে পারি ততটুকুই জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর। আমাদের দেহমন ভয়মুক্ত হউক, শান্তিলাভ করুক।

৩৩ অঞ্জলি। জ্ঞানং-দেবতা।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ! তুমি আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বলিত কর। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়েরই আকর তুমি। তুমি আমাদের হৃদয়দেবতা। তুমি আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হও এবং আমাদের আত্মাকে বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে সমুজ্জ্বল কর। তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর। তুমি আমাদের ভক্তিপূর্ণ পূজা স্নেহহস্তে গ্রহণ কর।

২। তুমি বিশ্বজগতের পালক। তুমি আমাদিগকে ধনৈশ্বর্য্য প্রদান কর এবং আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন কর। আমরা তোমার

শরণাগত হইতেছি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে পরাজয় প্রদান কর। হে অমৃতপুরুষ! তুমি আমাদের অন্তরে তোমার প্রতি অচল শ্রদ্ধা দাও, যাহাতে আমরা তোমার উপাসনা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের অধিকারী হই।

৩। হে সকল জ্ঞানের অধিপতি! তুমি এসো—তুমি এসো। আমরা তোমার নেতৃত্বে চলিয়া সকল প্রকার বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান আয়ত্ত করিব। আমাদের রসনা হইতে এবং আমাদের লেখনী হইতে যে সকল সত্যবাণী নিঃসৃত হইবে, সেই সকল বাণী জগতের হিতজনক ও আনন্দদায়ক হউক। আমাদের সেই সকল বাণী দ্বারা মিথ্যা অপহত হউক। তুমি আমাদিগের সহায় হও এবং আমাদিগকে সত্যপথে লইয়া যাও।

৪। তুমি আমাদিগকে যে সংসারে প্রেরণ করিয়াছ, সেই সংসার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ধন ও ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে যে অমৃতের পথ প্রদর্শন করিয়াছ, সেই পথে চলিবার উপযুক্ত অক্ষয় ধন আমাদিগকে প্রদান কর। আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দণ্ডায়মান হইব?

৫। ঋষি বিশ্বামিত্রের অন্তরে তুমি যে গায়ত্রী মন্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলে; ঋষি বিশ্বামিত্র যে গায়ত্রী মন্ত্র জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই গায়ত্রীমন্ত্রেই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি ব্রহ্মবিদ্যার বীজ জলন্তরূপে নিহিত আছে। হে মন্ত্রপতি! তুমি আমাদিগকে সেই গায়ত্রীমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার অধিকার এবং শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান কর।

৬। হে অমৃতপুরুষ! আমরা তোমার সন্তান। তোমার প্রেরিত এই গায়ত্রীমন্ত্র আমাদের সকল সুখের হেতু এবং সকল কল্যাণের কারণ হউক। এই গায়ত্রীমন্ত্রের সাধনা দ্বারা আমাদের অন্তর হইতে দ্বেষহিংসা নির্ম্মূল হউক। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া তোমার চরণস্পর্শের অধিকারী হই।

৭। হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা সেই অমৃতপুরুষকে ছাড়িয়া অপর কোন দেবতাকে ধরিয়া মুক্তিলাভের বৃথা আশা পরিত্যাগ কর। তোমাদের আত্মার মূল সেই পরমাত্মা। তোমাদের সমস্ত বলের মূল সেই বলদাতা। তোমাদের সমস্ত জ্ঞানের আকর সেই জ্ঞানদাতা পরমেশ্বর। তোমাদের যাহা কিছু ধন ঐশ্বর্য্য আছে, সকলেরই মূল সেই ঐশ্বর্য্যবান পরমপুরুষ।

৮। হে বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আমরা যেন প্রকৃতিতে তোমার প্রদর্শিত পথে চলিয়া সংসারসংগ্রামে জয়লাভের উপযুক্ত বলবীর্য্য সঞ্চয় করিতে পারি। নির্ভীক হৃদয়ে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে যেন সম্মুখীন হইতে পারি এবং বৃথা ভয়ে যেন আমরা সত্যের সন্ধানে পশ্চাৎপদ না হই। হে প্রজ্ঞানঘন পরমেশ! তোমার বজ্রাগ্নিতে আমাদের সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়া দাও এবং আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মোচিত কর, যাহাতে সংসারের কর্ম্ম শেষ হইলে সংসারপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি। বিজ্ঞান অথবা প্রজ্ঞান, কোন বিষয় অর্জ্জন করিতে যেন আমরা উৎসাহহীন না হই।

বিশ্বকল্যাণ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

বেহাগ

গৃহে গৃহে তোমার হাসি জাগাও
চিত্তে চিত্তে তোমার বাণী বাজাও।
সবাই সবায় বাসুক ভালো
প্রেমের প্রদীপ হৃদে জ্বালো—
স্বার্থ হিংসা দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ
এ দেশ হতে ঘুচাও।
সবাই সবায় জানুক আপন ভাই
সবাই সবায় দিক্ হৃদয়ে ঠাঁই।
সবাই জাগুক চিত্তে তোমায়
প্রণাম করুক তোমার ও-পায়
ভালবাসুক তোমায় সবাই
তুমি স্বর্গ হেথা সাজাও॥

অভিভাষণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহারাজা শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়)

বাঙ্গলার হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত হইল বটে, কিন্তু তখনও শূন্য রহিয়াছে, তখনও প্রার্থিত কাম্যবস্তু পাই নাই, তখনও চন্দ্রোদয়ের অপেক্ষায়

বঙ্গবাসীর হৃদয়-সমুদ্র অন্তরে অন্তরে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, চন্দ্রোদয়ে উদ্বেলিত হইয়া কূল ছাপাইয়া সৈকতভূমি প্লাবিত করে নাই, এমন দিনে বঙ্গের বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কোটালের বান যেমন কূল পরিপ্লাবিত করিয়া প্রধাবিত হয়, তেমনি বঙ্গের নরনারী, আবাল-বৃদ্ধবনিতা, আশা-আকাঙ্ক্ষার আনন্দে উৎসাহে অধীর হইয়া উঠিল। মন্দার-সাহায্যে মহাসিন্ধু মন্থনের পর যেমন একদিন ধন্বন্তরির হস্তে সুধাভাণ্ড দেখিয়া সুরলোকে আনন্দ-কোলাহল উঠিয়াছিল, তেমনি বঙ্কিমের কল্পনাসাগর-মথিতা 'কুন্দ', 'কপালিনী', 'আয়েষা' ও 'তিলোত্তমা'কে দেখিয়া সাহিত্যরসপিপাসু বঙ্গীয় জনের মধ্যে আনন্দকলরোল উঠিয়া পড়িল—সকলে অধীর হইয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, ব্যাকুল হইয়া "বঙ্গদর্শনের" পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রকার বন্ধনবিমুক্ত ইউরোপীয় স্বাধীন জাতিসমূহের সাহিত্য-দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞানের আস্বাদ লাভ করিয়া সে দিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, কিন্তু স্বগৃহের দৈন্য অন্তরকে পীড়া দান করিত। অক্ষমের, আশাহীনের যে বেদনা, সেই বেদনায় আমরা নিয়ত পীড়িত হইতেছিলাম। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার বিমল রশ্মিপাতে অন্ধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিল, নিজের গৃহকোণের উপেক্ষিতা সারস্বতলক্ষ্মীর অনুপম রূপলাবণ্যময়ী অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিল, সে দিনের তাহার আনন্দকে সে কি হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে? সে জানিত তাহার দীনা, পরমুখাপেক্ষিণী বঙ্গবাণী চিরদিন পরের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা পাইবার আশায় ভিক্ষাপাত্র হস্তে দাঁড়াইবে; অকস্মাৎ দেখিতে পাইল তাহা সত্য নহে, আমাদের চির উপেক্ষিতা বঙ্গবাণী ভিখারিণী নহেন, তাঁহার মূর্ত্তি বরাভয়দাত্রী রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি, তাঁহার সারস্বত নিকুঞ্জে মন্দার, পারিজাত ও হরিচন্দনের অপরূপ কুসুম-নিচয় প্রস্ফুটিত হইতে পারে, তাঁহার মানস সরোবরের সুবিমল সলিলে সহস্রারবিন্দ বিকশিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতে পারে। এতদিন বঙ্গবাসী কুরুক্ষেত্রের মহাসমরশায়ী পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় শরশয্যায় পড়িয়া দারুণ পিপাসায় নিরতিশয় কাতর ছিল, অর্জ্জুনের বাহুবলবিক্ষিপ্ত শরাঘাতে পাতালস্থা ভোগবতী ধারা যেমন পিতামহের তৃষিত কণ্ঠে নিপতিত হইয়া তাঁহার তৃষ্ণা বিদূরিত করিয়াছিল, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার বলে সমানীত সাহিত্যমন্দাকিনীর সুবিমল রসধারা তৃষাতুর বঙ্গবাসীর চিরতৃষ্ণা নিবারণ করিল। বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিল যে অন্য পথে নানাদিক হইতে শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের সম্মুখ-গতিকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতে পারে, কিন্তু এই সাহিত্যের পথেই তাহাদিগকে নিরাময় মুক্তি লাভ করিতে হইবে, এই সাহিত্যের পথেই অগ্রসর হইয়া একদিন তাহারা জগতের সভ্য সমাজে ঈপ্সিত বরণীয় আসন লাভ করিতে পারিবে। বঙ্কিম-চন্দ্রের মনেও বোধ করি সে আশা ছিল, সেই জন্য তাঁহার কথাসাহিত্যের মধ্যে পুরাণেতিহাস, ধর্ম্ম-কর্ম্ম কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। ধর্ম্মে কর্ম্মে, বলে বীর্য্যে, শৌর্য্যে ভাস্কর্য্যে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের কোথায় কি গৌরব ছিল তাহা সে দিনে যতদূর জানিবার উপায় ছিল, সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করতঃ তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং যে সাহিত্যের তিনি জন্মদাতা তাহাকে একদিন জগতের সাহিত্য-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে হইবে জানিয়া তাহাকে তিনি নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্যদানে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন এবং জগৎসভায় বসিবার উপযোগী যে সকল মণিময় আভরণ প্রয়োজন তাহাও যোগাইয়াছেন,—অঙ্গদ, কুণ্ডল, কেয়ুর, বলয় কিছুরই অভাব রাখিয়া যান নাই।

জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে হইলে, সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, তাহারই সহায়তায় জগতের সুসভ্য বরেণ্য জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে হইলে সাহিত্যের উপকরণরাজি স্বদেশ হইতেই আহরণ করিতে হইবে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি অম্বর রাজকুমারকে মান্দারণে আনিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শশি-শেখরের দৌহিত্রী তিলোত্তমার সহিত চারি চক্ষুর মিলন করিয়া দিয়াছেন; নিতান্তই বাঙ্গালী হরবল্লভের পুত্রবধূ নিরন্ন প্রফুল্লকে রাণী সাজাইয়া গুম্ফশ্মশ্রুহীন ভবানী পাঠক এবং চোগোগ্গাধারী রঙ্গরাজের উপর হুকুম চালাইবার অধিকার দিয়াছেন, পুণ্যতোয় অজয়তীরে জীবানন্দ-ভবানন্দকে অগ্নী উদ্গিরণকারী ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন, দ্বাদশ ভৌমিকের একতম, বঙ্গবীর সীতারামের সমরনৈপুণ্য বঙ্গবাসীর চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

জাতির দুঃখ-দুর্দ্দিনে, ঘটনাচক্রে, চতুর্দ্দিক হইতে ঘাত-প্রতিঘাতে মানবের অন্তর-বাহিরের সমস্ত শক্তি যখন প্রতিহত, সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তখন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকারে সমস্ত ঢাকিয়া যায়। সে সময়ে সাহিত্য গঠন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া আত্মশক্তি বিকাশ করতঃ সর্ব্ববিধ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়; আবার কোন কারণে সেই অন্ধকারের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেলে আশা-আকাঙ্ক্ষার নবোদিত অরুণ রশ্মি-রেখার দর্শনলাভ হয়। যখন মুসলমান-শক্তি-সবিতা অস্তমিত প্রায়, ইংরাজ-রাজশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে

পারে নাই, সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বঙ্গবাসীর সমস্ত শক্তি প্রতিপদে ক্ষুব্ধ, সংহত, সঙ্কুচিত হইতেছিল; রজনীর অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় তখন বাঙ্গালাদেশ স্তব্ধ মূক ও নীরব। উন্নতিশীল স্বাধীন দেশের নব নব ভাবসমৃদ্ধির সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইল, আনন্দে আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, প্রথম অরুণোদয়ের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বঙ্গ-সরস্বতীর সাহিত্য-বন-বৈতালিক মধুকণ্ঠপিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরলহরী পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল এবং বঙ্গসারস্বত-নিকুঞ্জের কলবিহঙ্গের দল নবোদিত উষার রক্তিমরাগ দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদের আনন্দ-কাকলীর মধু সঙ্গীতে বঙ্গের দিগ্ দিগন্ত পরিপূরিত করিয়া দিল।

যে বঙ্গসাহিত্য জগৎসাহিত্য সভায় একদিন চক্রবর্ত্তীর আসন গ্রহণ করিবে, যে সাহিত্যের আনন্দময় মঙ্গলালোক একদিন কেবল বঙ্গ নহে, ভারত নহে, ভূলোকের সর্ব্বত্র আলোকোদ্ভাসিত করিবে, যে সাহিত্যের মহতী শক্তি একদিন বঙ্গবাসীর সকল দৈন্য-দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিয়া তাহাকে শৌর্য্যে বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে জগতের বরেণ্য করিয়া তুলিবে, সেই সাহিত্যের ধাত্রীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে তাহার শৈশব ও কৈশোর পার করিয়া দিয়া যৌবনের প্রথম সীমারেখায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন।

সমাগতপ্রায় যৌবনের ওজোদীপ্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে যখন লাবণ্যবিস্তার করিবার উদ্যম করিতেছে, সেই বয়ঃসন্ধির মুহূর্ত্তে তাহার অভিভাবকের গুরুকর্ত্তব্যভার পড়িল, আজ যিনি জগদ্‌বরেণ্য ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহারই উপরে। তিনি কেবলমাত্র বঙ্গসাহিত্যনিকুঞ্জে বসন্ত সমাগমের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, সেই সারস্বতকুঞ্জের প্রত্যেক ব্রততী বল্লরী যাহাতে নিরুপম কুসুমসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে তৎপ্রতি তাঁহার চিরজাগ্রত দৃষ্টিকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিশোর সাহিত্যের সমাগতপ্রায় যৌবনের আনন্দ-সংবাদ দিয়াই তাঁহার কার্য্য সমাধা হয় নাই, তাঁহার মানস-খনিসঞ্জাত মহার্ঘ রত্নরাজি-খচিত কিরীট, কুণ্ডল, কণ্ঠহার প্রভৃতি রাজসম্ভ্রমোচিত অমূল্য অলঙ্কারে তাহার সর্ব্বাবয়ব ভূষিত করিয়া তাহাকে বিশ্বসাহিত্য-সভায় সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার যাদুকরী কল্পনাকে দেশদেশান্তরের সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ করিয়া স্বীয় সাহিত্যের রাজ-বেশ প্রস্তুত করিতে হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরের নিকট ঋণদ্বারা প্রাপ্ত ভূষণ দৈন্যেরই পরিচায়ক, তাহাতে আত্মশক্তির বিকাশ হইবে না এবং তাহা না হইলে সর্ব্বপ্রকার মানসিক বন্ধন মোচন হইবে না, সাহিত্যের শক্তিপ্রভাবে বঙ্গবাসী মুক্তির আনন্দ পাইবে না, তাই তিনি বাঙ্গালার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেখান হইতেই উপাদান আহরণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন; বাঙ্গলার ঘনচ্ছায়াসমন্বিত পল্লীভবনে সুস্নিগ্ধ চূতনিকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসিয়া পরভৃত কেমন করিয়া তাহার মধু কণ্ঠের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়, নিদাঘের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে কাষায়-বাস পরিহিত তাপসের ন্যায় বৈশাখের তাম্রমূর্ত্তি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কি সৌন্দর্য্য উপস্থিত করে, হেমন্তের রৌদ্র, পীত, হিরণ্য অঞ্চলাচ্ছাদিতা উদাসিনী বসুন্ধরার অপরাহ্ণ-ছবি আমাদের অন্তরকে কেমন করিয়া ঔদাস্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, তৎসমুদয়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কুহকী কল্পনা প্রভাবে আমাদের নয়নসম্মুখে ধরিয়াছেন।

সুরসভাতলে নৃত্যপরায়ণা উর্ব্বশীর নৃত্যচ্ছন্দের তালে তালে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ কেমন করিয়া উচ্ছ্বসিত হয়, মলয়সম্পৃক্ত মন্দমারুতের মৃদুহিল্লোলে হরিৎ শস্যক্ষেত্রের শীর্ষ কেমন করিয়া শিহরিয়া উঠে, সান্ধ্যসমীর স্পর্শে স্বচ্ছতোয়া "গুস্তার" বারিরাশি অপ্সরীর কেশদামের ন্যায় কেমন করিয়া কুঞ্চিত হয়, কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব কল্পনা প্রভাবে সে সমুদয়ও আমরা যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাই।

যে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান কান্তি পুষ্টি ও শ্রীসৌন্দর্য্য লইয়া আমরা বিশ্ব-সাহিত্য সভায় গর্ব্ব করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি মনে করি, বাঙ্গলার সে গদ্য সাহিত্য কতকাল হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমার পক্ষে বলা কঠিন। সমস্ত পদার্থই যেমন বিবর্ত্তন-নীতির বলে ক্রম-বিকাশ লাভ করে, সাহিত্যেও তাহা না হইবার কথা নহে। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে মনে হয় যে আমাদের বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া স্তরে স্তরে উঠিয়া আজ এই শ্রীসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াছে। ইহার প্রথম স্তরকে 'শূন্য পুরাণের' স্তর বলা যাইতে পারে, কারণ শুনিতে পাই যে শূন্য পুরাণ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। তাহার পরে কিছু সময় গিয়াছে কিনা এবং আর কিছু রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। পরে শ্রীরূপ গোস্বামীর "কারিকা", কৃষ্ণদাসের "রাগমণিমালা", ক্রমে ক্রমে "বৃন্দাবনলীলা", "শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা" প্রভৃতি রচিত হয়। সে সময়ে বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, উহা লালিত্যহীন, নীরস সাহিত্য ছিল। তৎপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার

ইংরাজগণ বঙ্গভাষার অঙ্গ পরিপুষ্টির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন—কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরাজগণ যে বাঙ্গলা ভাষা প্রস্তুত করিলেন তাহা হইল খৃষ্টানী বাঙ্গলা। সে ভাষা বঙ্গবাসীর নিকট আদর পাইল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিতমহাশয়গণ যাহা রচনা করিলেন তাহা হইল পণ্ডিতী বাঙ্গলা, সে ভাষাও পণ্ডিতমহাশয়গণের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞদিগের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল, পাঠকসাধারণ তাহার সমাদর করিল না। পণ্ডিতী বাঙ্গলায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য এবং খৃষ্টানী বাঙ্গলা উর্দ্দু বহুল হইয়া বঙ্গবাসীর নিকট উহা প্রায় অপাঠ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের আট বৎসর মাত্র পরে "বেণ্টো" সাহেবের "প্রশ্নোত্তরমালা" বোধ করি বঙ্গে ইংরেজাধিকারের পর প্রথম বাঙ্গলা গ্রন্থ। পণ্ডিতমহাশয়গণ যাহা রচনা করিলেন সেগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইল, দৃষ্টান্তস্বরূপ "হিতোপদেশ", "পুরুষপরীক্ষা," "প্রবোধচন্দ্রিকা" প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে; মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতির গদ্য সাহিত্য, সুধী সমাজে সুপরিচিত।

ইহাকে যদি বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের প্রথম স্তর বলা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় স্তর যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহনের যুগে। যদিও এই যুগকে অনুবাদের যুগ এক হিসাবে বলা যাইতে পারে, তথাপি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গবাসী মুক্তির যে প্রথম রবিরশ্মিরেখা দেখিতে পাইয়াছিল রামমোহনই সে পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য বাঙ্গালী আজ সাহিত্যকেই আশ্রয় করিয়াছে, এই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যই সে আশার প্রদীপ প্রথম প্রজ্বালিত করে। এই উনবিংশ শতাব্দীতেই খৃষ্টানী বাঙ্গালার জন্ম, এই শতাব্দীতেই পণ্ডিতী বাঙ্গালার অভ্যুদয়, এই শতাব্দীতেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, আবার এই শতাব্দীতেই "বঙ্গীয় সাহিত্য সভা" পত্রিকার জন্ম হয়। আজ আমরা প্রতিদিন, আমাদের বাঙ্গালাদেশে অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা সাগরের জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রতিদিন জন্মিতে ও কালের সর্ব্বগ্রাসী গর্ভে বিলীন হইতে দেখিতেছি, কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতেই ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় লাভ হয়, এই সকল কারণে এই উনবিংশ শতাব্দী বঙ্গসাহিত্য-ইতিহাসে এক বরণীয় যুগ।

যে মহাপুরুষ শিশুশিক্ষার জন্য "বর্ণপরিচয়" হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বিষয়ের বহু গ্রন্থ রচনা করতঃ বঙ্গবাসীকে শব্দশক্তির সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, সেই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের যুগই বঙ্গসাহিত্যের তৃতীয় স্তরের যুগ বলা যাইতে পারে। এই যুগে ঈশ্বরগুপ্ত, অক্ষয়কুমার, ভূদেব প্রমুখ মনস্বিগণ কেবল যে বঙ্গবাসীর সম্মুখে এক শক্তিময়ী ভাষার মূর্ত্তিকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, বঙ্গবাণীর চিন্তাস্রোতকে নানাপথে পরিচালিত করিয়া এক মহৎ ও বৃহৎ বাঙ্গালী জাতি গঠন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন।

যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি ভাষার বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল অংশেই পতিত হইয়াছে। তিনি রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী লইয়া যেমন "সীতার বনবাস" "শকুন্তলা" প্রভৃতি সে কালের উপাদেয় গ্রন্থনিচয় রচনা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি বিরাম, বিস্ময়, প্রশ্ন প্রভৃতি সূচক চিহ্নের প্রবর্ত্তনও বাঙ্গলায় তিনিই করিয়া গিয়াছেন; বোধ করি তৎপূর্ব্বে সংস্কৃতের অনুকরণে পয়ারাদি ছন্দের পংক্তির পরে ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ ব্যতীত গদ্য রচনায় কোন চিহ্নের ব্যবহার ছিল না, অন্ততঃ ছিল বলিয়া আমার জানা নাই।

যে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই মনে করিত যে লিখিবার মত কিছু লিখিতে হইলে, তাহা ইংরাজীতে লিখিতে হইবে, সেই যুগে—যে যুগে শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাহার অন্ধকার মাতৃ-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকল সম্পদ সৌভাগ্যের জন্য সাগরপারের দিকেই তাহার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিত, সেই যুগে বাঙ্গালীর বঙ্কিমের আবির্ভাব হইল। সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত, বঙ্গের দীক্ষাগুরু দেখাইয়াছিলেন যে বঙ্গবাণীর হস্তস্থিত বীণা আনন্দে হাসে, বেদনায় কাঁদে, সে বীণার তন্ত্রীতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা ফুটিয়া উঠে, তাহার তন্ত্রীর ঝঙ্কারে লজ্জা, ঘৃণা, সঙ্কোচ, অনুরাগ, প্রেম ভক্তি সমস্তই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। বঙ্কিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল—বাংলার গদ্য কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অনুকরণ করিবে, না "টেকচাঁদি" ছাঁদে উহাকে গঠিত করিতে হইবে? ইহার মীমাংসা তখনও হয় নাই, বিদ্বজ্জন-সমাজে সেই জটিল প্রশ্ন লইয়া বাদ-বিসম্বাদ তখনও চলিতেছে, এমন সময়ে এক শুভ-মুহূর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভালোকে বঙ্গবাসী বঙ্গবাণীর এক অভূতপূর্ব্ব মহিমমণ্ডিত মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সরস্বতীর বরাভয়দাত্রী কল্যাণময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ের সে জটিল প্রশ্নের আজিও চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না; তাহার ফলে দাঁড়াইয়াছে যে বঙ্গসাহিত্যে দুইটি পৃথক রচনা-রীতি একসঙ্গে চলিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ "বীরবল" যে রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে অধুনা যে রীতির

কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়, বঙ্গের অনেক যশস্বী সাহিত্যিক সেই রীতি অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেছেন। আবার অন্য একশ্রেণীর ক্ষমতাশালী লেখক কথ্য ও লেখ্য ভাষাকে পৃথক রাখিয়া প্রতিদিন বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন; ইহার কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, সাহিত্য লোক-মনোমোহিনী ও শক্তিশালিনী হইবে, কিসে সাহিত্যের মর্য্যাদা সম্যক রক্ষিত ও দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমার মনে হয় তাহার একমাত্র বিচারক কাল; কালই ইহার মীমাংসা করিতে সমর্থ এবং হয়ত কালই তাহা করিবে। তবে এই সমবেত বিদ্বজ্জনসঙ্ঘের সম্মুখে সভয়ে, সসঙ্কোচে আমি এই মাত্র নিবেদন করিতে চাহি যে, বাঙ্গলার সাহিত্য স্থান-বিশেষ বা স্থানবিশেষের কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গের সামগ্রী; কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে থাকিলে সকল স্থানের, সকল লোকের পক্ষে তাহা বোধ্য হইবে কিনা ইহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা—কলিকাতার কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত বলিয়া এক দাবী উপস্থিত করা যাইতে পারিলেও, উহা বিচারসহ কি না তাহাও আপনাদের এই সম্মিলনের বিবেচনার অধীনে আনা উচিত কি অনুচিত সে কথার মীমাংসা আপনারাই করিবেন।

ধর্ম্ম যেমন জাতিকে এক সূত্রে বন্ধন করে, সাহিত্য দ্বারাও সেই কার্য্য সাধিত হয়। সেই কারণে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষমতা, ধর্ম্মের ক্ষমতা অপেক্ষা কম নহে। সাহিত্যই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতির একমাত্র মহামিলন-ক্ষেত্র। এক অখণ্ড দুশ্চ্ছেদ্য বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে বঙ্গসাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর আছে কি না আমি জানি না। তাই মনে হয় লেখ্য ভাষা, কথ্য ভাষা হইতে পৃথক্ না হইলে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠিত করিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিবে। নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির ভাষার গতি কিরূপ হইবে, তাহার সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত, বর্দ্ধিত, মর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া বাঙ্গালীর কাম্য ফল তাহাকে দান করিবে, সাহিত্যের শক্তি সহায়ে বিশ্বের সকলের সহিত বাঙ্গালী একাসনে কেমন করিয়া বসিতে পারিবে, সে বিচারের ভার আপনাদের উপরে, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল সাহিত্য-সম্মিলন; আশা করি এই সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর সুপরামর্শে বঙ্গ-সাহিত্য তাহার উপযুক্ত রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে—যে সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া এক বাঙ্গালী আর এক বাঙ্গালীকে ভাই বলিয়া ডাকিবে, যে সাহিত্য সমাজ, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বৈষম্য বিদূরিত করিয়া দিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় ঐক্য সূত্রে হৃদয়ের সহিত হৃদয়কে গাঁথিয়া দিবে, যে সাহিত্য সমগ্র বঙ্গবাসীকে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক সাধনার পথে ধাবিত করিবে, যে সাহিত্য বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের চিত্র চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া ধরিবে, ভবিষ্যতে যে সাহিত্য বঙ্গবাসীকে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে তাহার সমস্ত যুগযুগান্ত-ব্যাপী চেষ্টা, প্রয়াস ও উদ্যমকে ধন্য, সার্থক ও কৃতকৃতার্থ করিয়া দিবে।

বঙ্গগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও জয়দেবের সমালোচনা সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাঙ্গলা সাহিত্যের আর যত কিছু দুঃখই থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। অন্যান্য কবিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক বৈষ্ণবকবিদিগের গীতিকাব্যই সমুদ্রবিশেষ। জগতের সমস্ত ব্যাপারই পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপরে নির্ভর করে, সাহিত্যও তাহাই করিয়া থাকে। আর্য্যগণ যখন এদেশে আসিয়া নব নব স্থান অধিকার করিতে ব্যস্ত, পূর্ব্বনিবাসীগণকে পরাজিত, বিধ্বস্ত করিয়া স্বাধিকার স্থাপনে একাগ্রচিত্ত, সে সময়ে তাঁহাদের বাহু বলদৃপ্ত, অন্তর তেজঃপরিপূর্ণ, সেকালের সাহিত্য রামায়ণ। যখন আরব্ধ কার্য্য শেষ হইল, দেশ অধিকৃত হইল, সকলে যাহা জয় করিয়াছে কে তাহা ভোগ করিবে ইহারই মীমাংসা যখন একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইল, ধনধান্যপরিপূরিতা বসুন্ধরা যখন করায়ত্ত হইল, আর্য্যপ্রকৃতি তখন ভোগাভিলাষী হইয়া উঠিল, অন্য শত্রুর অভাবে গৃহবিবাদ তখন আরম্ভ হইল, সেকালে জন্মিল মহাভারত। তাহার পরে কালান্তরে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ভোগ এবং ত্যাগ যখন একত্রে বসবাস আরম্ভ করিল তখন পুরাণ আসিয়া দর্শন দিল। তাহার পরে আর্য্যগণ এমন এক দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে শৌর্য্যবীর্য্যসমন্বিত আর্য্যপ্রকৃতি কোমলভাবাপন্ন হইতে লাগিল, তাঁহাদের স্বাভাবিক তেজ বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল, আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল; এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ; সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের এইচিত্র একালের চিত্র নহে, সাত আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর চিত্র বটে। আজও হয়ত বাঙ্গালী গৃহসুখপরায়ণ, নিশ্চেষ্ট অলস হইতে পারে, কিন্তু আজ বঙ্গবাসীর অন্তরে তাহাদের সাহিত্য নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে। এমন জনও হয়ত আজি বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতে পারে, যাঁহার কণ্ঠে স্বয়ং শ্রী আসিয়া জয়মাল্য পরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র,

কিন্তু তিনি দেশের সাহিত্যের প্রভাবে দেশমাতৃকার অন্নপূর্ণারূপিণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারই পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। একালের কবিতায় বঙ্গবাণীর সেই মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছে যাঁহার হস্তস্থিত অগ্নিবীণা অনল বর্ষণ করে; রবীন্দ্রনাথ সেই কবিকুলের সম্রাট। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, নিত্য নূতন রচনায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালীর কাব্যজগতকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা সকলে সম্ভব না; বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের তৃণবংশবিনির্ম্মিত কঙ্কালবৎ "কাঠামো"র উপরে দশপ্রহরণধারিণী, সর্ব্বাভরণভূষিতা, শক্তিময়ী, দুর্গতিহরা, দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বাঙ্গলার পদ্যসাহিত্যের রচনারীতি আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনব ছন্দের মাধুর্য্যময় নবীন ঝঙ্কারে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ, মোহিত ও স্পন্দহীন করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পয়ার, সেই লঘু বা দীর্ঘ ত্রিপদী, সেই সব, কিন্তু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, সারদার আনন্দদুলাল রবির ইন্দ্রজাল প্রভাবে তাহাদের প্রাচীনা মূর্ত্তি কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়া অভিনব পরিচ্ছদে সর্ব্বাবয়ব আবৃত করিয়া তাহারা নবযৌবনসম্পন্না নবীনা যুবতী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, বঙ্গবাসী আর তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। মধুসূদন ইংরাজী 'সনেট'কে বাঙ্গলা কবিতায় স্থান দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার চতুর্দ্দশপদী মূর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে কখনও দ্বাদশী কখনও ষোড়শী কখনও বা অষ্টাদশীরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের মন মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার এই নবযুগের অসামান্য শক্তিসম্পন্ন বিদ্যাপতিকে ঘিরিয়া তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী যে সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার মূল বীজমন্ত্র বাজিয়া উঠিয়াছে সেই গানে, যে গান শুধু বাঙ্গলার নহে, সমগ্র ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি" বলিয়া রণ্ রণ্, ঝণ্ ঝণ্ রবে বাজিয়া উঠিয়াছে। *

অনন্ত জীবন। †

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

অনেকে বলেন যে, যদি মানুষের জন্য পরকাল থাকে তবে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের জন্যই বা না থাকিবে কেন? আর যদি উহারা মরিলেই ফুরাইয়া যায় তবে মানুষও মরিলে যে ফুরাইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান বিশ্বের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে, প্রকৃতিকে প্রভূত পরিমাণে বশীভূত করিয়াছে, নানাপ্রকার যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়াছে এবং বিবিধ শিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই সত্য বলিয়া মান্য করে আর সহজবুদ্ধি ও হৃদয়ের বাণীকে কল্পনা বলিয়া তুচ্ছ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টি কেবল বহির্জ্জগতের দিকে। এইজন্য কেবল বিজ্ঞানের অনুশীলনে মানবের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে এবং ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভক্তিভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের চক্ষে ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে আত্মার অনুভূতি প্রমাণই নয়। তবে যদি কোন ঘটনা তাড়িত, উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি জড়শক্তির সাহায্যে বুঝা না যায় তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বিজ্ঞানের আপত্তি নাই। মানবপ্রকৃতি বুঝিতে হইলেও বিজ্ঞানের মতে উচ্চশ্রেণীর জন্তুর সহিত মানবদেহের তুলনা করা কর্ত্তব্য। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া যদি আমরা মানুষের দন্ত, কঙ্কাল ও মস্তিষ্কের সহিত গরিলা সিম্পাঞ্জী প্রভৃতি জন্তুর দন্ত, কঙ্কাল ও মস্তিষ্কের তুলনা করি, তবে মানুষ ও উহাদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই সাদৃশ্য এত প্রবল যে প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মানুষকে ইহাদিগের সহিত একই শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন; তবে তাঁহাদের মতে মানুষ গরিলা, সিম্পাঞ্জী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা মানুষকে প্রাণীরাজ্যের ক্রমোন্নতির চরম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে বাহির হইতে দেখিলে মানুষকে যতই বড় বলিয়া লাগুক না কেন, অন্যান্য জীবজন্তুর মৃত্যুতেই অবসান আর একমাত্র মানুষই অনন্তজীবনের অধিকারী,—এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যদি আমরা মানুষের প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে চাই তবে বাহির হইতে না দেখিয়া মানুষের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করা প্রয়োজন।

আত্মা ও প্রাণ অবশ্য এক নহে। অধ্যাত্মরাজ্য ও প্রাণরাজ্য দুটি স্বতন্ত্র জগৎ। অধ্যাত্মরাজ্যে ইতর প্রাণীদিগের কোন স্থানই নাই। ন্যায়-অন্যায়,

* 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'—১৩৩২ বৈশাখ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।
† ডাক্তার মার্টিনোর একটা উপদেশের ভাব গ্রহণ করিয়া লিখিত। (The place of Man in the Scale of Life.)

সত্য-মিথ্যা, পাপপুণ্যের অনুভূতিই তাহাদের নাই। আমরা পরমেশ্বরকে মঙ্গলময়, জ্ঞানস্বরূপ ও শুদ্ধসত্ত্ব বলি। মঙ্গলের ভাব কিয়ৎপরিমাণে আমাদেরও আছে; সন্দেহ অবিশ্বাস আমাদের জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বটে, তথাপি কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানও আমাদের আছে; আমাদের পবিত্রতার আদর্শ মলিন ও ক্ষুদ্র হইলেও পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা আমাদেরও কথঞ্চিৎ আছে। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির একটা সাদৃশ্য আছে। এই অর্থেই পরমেশ্বর মানবের পিতা ও মানব তাঁহার সন্তান। অন্যান্য প্রাণীকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে তাহাদিগকে ঈশ্বরের সন্তান বলা যায় না। শরীর হিসাবে মানুষ নিশ্চয়ই প্রাণীরাজ্যের অন্তর্গত, কিন্তু মানবের হৃদয়, মন ও বিবেকের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সে আধ্যাত্মিক জগতেরও প্রজা। এই কথাটী অতি গভীর। ইহারই উপরে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই কথা তুচ্ছ করিয়া কেবল বাহির হইতে মানবকে দেখ; সাধুতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে তোমার যে অন্তর্দৃষ্টি সেই অন্তর্দৃষ্টিকে একবার অবিশ্বাস কর; তোমার আত্মা আছে কি না একবার সন্দেহ কর, এবং আপনাকে ইন্দ্রিয়গ্রামে অবরুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের বাণীকে তুচ্ছ কর,— দেখিবে অচিরেই তোমার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে।

মানুষও ইতর প্রাণীদের সহিত সমান ভাবেই যন্ত্রণা ও মৃত্যুর অধীন বলিয়া লাগে; কিন্তু তাহাদের জীবন আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর মূর্ত্তি পশু-পক্ষী ও মানবের নিকট কত বিভিন্ন। ইতর প্রাণীদের মধ্যে যে স্নেহ-মমতা আছে তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু সচরাচর ইতরপ্রাণীরা দুর্ব্বলকে ঘৃণা করে, আহতকে কষ্ট দেয় ও নিজেরাই সজাতীয় মুমূর্ষুকে বধ করে। ব্যাঘ্র-শিশু আহত জননীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পক্ষী মাতা রুগ্ন শাবককে বাসা হইতে গাছের নীচে ফেলিয়া দেয়। যদি ছানাগুলি সুস্থ ও সবল থাকে তবেই তাহাদের মাতা বহু কষ্ট করিয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করে, তাহাদিগকে খাদ্য আহরণ করিতে শিক্ষা দেয় এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে। কিন্তু যদি ছানাগুলি রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয় তাহাদের প্রতি কিছুমাত্রও মায়ামমতা প্রদর্শন করে না। ইহার সহিত অক্ষম ও রুগ্ন মানবশিশুর প্রতি তাহার পিতামাতার স্নেহের তুলনা কর। পীড়িত সন্তানের কণ্ঠ হইতে যতই কাতরধ্বনি উত্থিত হয় ততই তাহার পিতামাতার প্রাণ গলিয়া যায়। আবার বৃদ্ধ, দুর্ব্বল জনকজননীর প্রতি সন্তানের কি গভীর প্রীতি-ভক্তি একবার স্মরণ কর। জীবনের আশা ফুরাইয়া আসিতেছে বলিয়া কি মুমূর্ষু পিতামাতার প্রতি পুত্রকন্যার সেবাযত্নের ত্রুটি হয়? যে শত্রুকে ক্রোধে অন্ধ হইয়া এক ব্যক্তি বধ করিতে উদ্যত, সেই শত্রু আহত হউক—তাহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়া মানুষ তাহার কত সেবা-যত্ন করে। ইতর প্রাণীদের নিকট প্রাণই সর্ব্বস্ব। যাহা কিছু প্রাণের প্রতিকূল পশুপক্ষীরা তাহাই পরিহার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে দুঃখযন্ত্রণার একটা সুমহান্ উদ্দেশ্য আছে। দুঃখযন্ত্রণাতেই মানব-অন্তরে স্নেহমমতার বিকাশ ও দেবত্বের স্ফূর্ত্তি। যিনি মানবহৃদয়ে স্নেহমমতার বীজ বপন করিয়াছেন তিনিই মানবজীবনে দুঃখযন্ত্রণার মূল নিহিত করিয়াছেন। সত্য বটে, দুঃখনিবারণের চেষ্টা না করিয়া অলসভাবে দুঃখভোগ করিয়া যে ধর্ম্ম হয় তাহা নহে। মানুষের অধিকাংশ দুঃখের মূলে সাধে নিরাশা এবং স্নেহপ্রেমের প্রতিদানে তাচ্ছিল্য ও অনাদর। এই পরীক্ষাতেই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা দুঃখকষ্টে অভিভূত হয়, কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তিগণের অন্তরে দুঃখকষ্ট আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করে ও করুণার নির্ম্মল উৎস খুলিয়া দেয়। যখন দিবসের আলো নিবিয়া যায় তখনই যেমন নৈশাকাশে নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠে, তেমনি যখন সংসারে সুখের আলো নিবিয়া যায় তখনই মানুষের অশ্রু-ধৌত নয়নে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর মধ্যে বিধাতার অভিপ্রায় নূতনভাবে প্রকাশ পায়। যাহারা আলোক দেখিয়াছে তাহারাই যেমন অন্ধকার যে কি তাহা বুঝিতে পারে, যাহারা

শব্দ শুনিয়াছে তাহারাই যেমন নিস্তব্ধতার প্রকৃত পরিচয় জানে, তেমনি যাহারা মৃত্যু দেখে তাহাদেরই নিকট জীবনের গভীর মর্ম্ম প্রকাশিত হয়, এবং যাহাদের সংসারের সুখ ফুরাইয়া যায় তাহাদের অন্তর ভগবানের গম্ভীর আবির্ভাবে পূর্ণ হয়।

ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে আর একটি ভিন্নতার কথা দেখা যাউক। সকলেই দেখিয়াছেন, পশুপক্ষীরা অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রকাশ করে। জ্ঞানই বলি, বুদ্ধিই বলি, সংস্কারই বলি—ইহার নাম যাহাই হউক—ইহার কথা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। কিন্তু ইহার একমাত্র লক্ষ্য জীবনরক্ষা—নিজেদের জীবনই হউক আর শাবকদিগের জীবনই হউক—জীবনরক্ষাই এই শক্তির একমাত্র লক্ষ্য। ইতরপ্রাণীদিগের যাহা কিছু আছে সমস্তই তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন। প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট এই সত্য এমন সুপ্রতিষ্ঠিত, যে যখনই তাঁহারা কোন প্রাণীর দেহ পরীক্ষা করিয়া একটা কিছু নূতন যন্ত্র দেখিতে পান অথবা তাহাদের জীবন আলোচনা করিয়া একটা কোন নূতন সংস্কার দেখিতে পান,তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ প্রাণীটির জীবনসংগ্রামে উহা কোনরূপে না কোনরূপে সাহায্য করে। ইতর প্রাণীদিগের যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই যদি তাহাদিগের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় তবে জীবনান্তে তাহাদের আর কিছুই থাকিবে না ইহাও নিশ্চয়। যদি মানুষের সম্বন্ধেও এই কথা সত্য হয় তবে শাস্ত্রে যতই পরলোকের কথা থাকুক ও পরলোকের পক্ষে আমরা যতই তর্কযুক্তি দেখাই না কেন, পরলোকে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যাইবে।

শারীরিক কষ্ট নিবারণের চেষ্টা ও আত্মরক্ষার চেষ্টা ইতরপ্রাণী ও মানুষের সমান; তবে মানুষ যে পশুপক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা কি এই বলিয়া যে উহারা কাঁচা ঘাসপাতা বা আম মাংস ভক্ষণ করে আর আমরা খাদ্যসামগ্রী অগ্নিতে রন্ধন করিয়া ভোজন করি? মানুষ যে শ্রেষ্ঠ তাহা কি এই বলিয়া যে উহারা গিরিগহ্বরে ও বৃক্ষকোটরে বাস করে আর আমরা সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করি? মানুষ যে শ্রেষ্ঠ তাহা কি এই বলিয়া যে পশুপক্ষীদের দেহ লোম ও পালকে আবৃত, আর আমরা সুন্দর সুন্দর রেশম, পশম ও কার্পাস বস্ত্রে শীত নিবারণ করি? মানুষের প্রাধান্যের কি এই প্রমাণ যে পশুরা নখ ও দন্ত দিয়া যুদ্ধ করে আর আমরা আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করি? এ গুলি যে মানুষের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এগুলির লক্ষ্য জীবনরক্ষা, এগুলি মানুষের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ নয়, এগুলিতে মানুষের অধ্যাত্মজীবনের পরিচয় নাই। শরীরটা মানুষের সর্ব্বস্ব নয়, শরীর অপেক্ষা মন বড়; শরীরটা মনের যন্ত্রমাত্র, শরীরটার মূল্য মনের জন্য। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও দৈহিক ভোগবিলাসই যাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাহাকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না। মানুষ শরীরকে তুচ্ছ করিয়া মনকেই বড় বলিয়া মানে। আরো উচ্চভূমিতে যাও, মনের প্রাধান্য আরো সুস্পষ্ট হইবে। বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মানুষের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে না; জীবনসংগ্রামে তাহারা কোন কাজে লাগে নাই; কিন্তু এই দুটি ভাবই সমুদয় শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মূলে। এই দুটি ভাব মানবহৃদয়কে কি অপূর্ব্ব গৌরব ও গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে!

ইতর প্রাণীরা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রেয়ের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু মানবজীবনের মূলে চিন্তা। এই দুই প্রকার জীবনে যে কত প্রভেদ,দেশ ও কালের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে বুঝা যায়। পশু-পক্ষীদের কার্য্যের মূলে জ্ঞানবুদ্ধি নাই, অথচ সহজভাবে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের ও শাবকদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যথাকালে তাহারা অতি চমৎকার ব্যবস্থা করে। তাহাদের না আছে ঘড়ী না আছে পঞ্জিকা, অথচ যখন যাহা করিলে ভাল হয় ঠিক সময়ে ঠিক তাই করে। তাহাদের মধ্যে কেহ অল্পকাল কেহ দীর্ঘকাল জীবিত থাকে কিন্তু বয়ঃক্রমের হিসাব তাহারা রাখে না এবং পলে পলে যে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে সে কথাও তাহারা জানে না। তাহাদের কার্য্যের মধ্যে অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের ভয় ও আশা কিয়ৎ পরিমাণে প্রবেশ

করে বটে কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই নিবদ্ধ, তাহারা বর্ত্তমানের কারাগারের বন্দী। তাহারা উপস্থিতমত কাজ করিয়া যায়। তাহাদের যে একরূপ সময়ের ধারণা আছে তাহা সম্ভব, কিন্তু তাহার সহিত মানুষের তুলনা কর। ইতর প্রাণীরা তাহাদের অতীত ইতিহাসের কোন সংবাদ রাখে না। নিজেদের আহারসংগ্রহে সমর্থ হইলেই পিতামাতার সহিতও সম্বন্ধ থাকে না। মৃত্যুর মূর্ত্তি মানুষ ও ইতরপ্রাণীদিগের নিকট কত বিভিন্ন! আত্মীয়স্বজনকে হারাইলেই যে মৃত্যুর ছায়া আমাদিগকে স্পর্শ করে তাহাও নহে; স্বদেশ ও বিদেশ হইতে, শতাব্দীর পর শতাব্দী হইতে, যুগ যুগান্তের পরপার হইতে মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ হয়। কতকাল হইল শাক্যসিংহ ও যীশু ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, অথচ আমরা অনুভব করি যে তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহাদের দেবচরিত্র স্মরণ করিয়া আমরা যে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করি তাহার অর্থ এই যে আমরা বর্ত্তমানে রুদ্ধ নহি, জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহি, কিন্তু যুগ-যুগান্তরের জীব। বাস্তবিকই মানবজীবনের গভীর ব্যাপারগুলি জন্মমৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিয়া সুদূর অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। এই যে অনন্তকালের সহিত মানবের সম্বন্ধ ইহার কি কোন অর্থ নাই? যদি ইহার কোন অর্থ না থাকিত তবে হয় ত অনন্তকাল এমন গম্ভীর ভাবে আমাদের চিন্তার বিষয় হইত না।

দেশ বা স্থান সম্বন্ধেও সেইরূপ মানবের চিন্তা আপনার বাসভূমির ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের অভিমুখে ছুটিয়াছে। পশুপক্ষীদেরও স্থান সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণা আছে, কিন্তু ইহার সহিত মানবের ধারণার একবার তুলনা কর। ঐ যে খর্ব্বাকৃতি লোকটি সারারাত্রি জাগিয়া মানমন্দিরের দুরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী নীহারিকাপুঞ্জ পরিদর্শন করিতেছেন, ও কিসের আকর্ষণ তাঁহাকে এমন বিহ্বল করিয়াছে? যে প্রাণীকে এত দূরের সামগ্রী এ ভাবে মুগ্ধ করে সে প্রাণী কিরূপ? তাহাকে কি লাঙ্গুলহীন বানরবিশেষ বলিলেই তাহার কি যথেষ্ট বর্ণনা হইল? চিন্তার বিশালতার সহিত কি প্রাণের বিপুলতার কোন সম্বন্ধ নাই? অনন্তের জ্ঞান ও অনন্তের ধ্যান যাহাকে এরূপ আকুল করে তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই অনন্তের মূল নিহিত রহিয়াছে। সে নিশ্চয়ই অনন্তের সন্তান।

সর্ব্বোপরি যদি আমরা বিবেকের কথা ভাবিয়া দেখি তবে আরো সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমান জীবন পরলোকের সূচনা ও অঙ্কুর। বিবেকইত মানবপ্রকৃতির মুকুট। ইতর প্রাণীগণ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির পরিচালনায় উপস্থিতমত কাজ করিয়া যায় এবং যখন যাহা করে তখনই তাহার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি নিরন্তর ধারা আছে। তাহার এক একটা দুষ্কর্ম্মের জন্য সারাজীবন আক্ষেপ করিয়াও আক্ষেপ ফুরায় না। যতদিন পাপের উপযুক্ত দণ্ড না হয় ততদিন পাপের স্মৃতি তাহাকে দংশন করিতে থাকে। এই জন্যই দেখা যায় যে কত লোক বিশ কি ত্রিশ বৎসরের পরেও গুপ্ত অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক রাজদ্বারে দণ্ডপ্রার্থী হয়। পাপের ক্ষয় নাই কেন? বিবেকের বিস্মৃতি নাই কেন? দুষ্কর্ম্ম পুরাতন হইলেও দণ্ডের খণ্ডন নাই কেন? আমাদের অন্তরের সাক্ষ্য এই যে ধর্ম্মরাজ্যে সময় নাই। আমরা যদি বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া বিপথে যাই তবে শাস্তি অপরিহার্য্য—তাহার শাস্তি হইবেই হইবে। পৃথিবীতে যদি না হয় পরলোকে হইবে। পরলোক না থাকিলে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা কোথায়? যাঁহারা দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করিয়া সত্যের সাক্ষ্য দিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য দারিদ্র্য ও কারাবাসকে বরণ করিয়াছেন, যাঁহারা মিথ্যা কথা বলার অপেক্ষা ঘাতকের কৃপাণে অস্থি হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস বিচ্ছিন্ন করিতে দিয়াছেন ও ক্ষুধিত সিংহব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন—তাঁহারা কি এই সকল নৃশংস অত্যাচার ভোগ করিয়া চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়াছেন? তাঁহারা কি আর জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে সমুত্থিত হইবেন না? তাঁহারা হয়ত নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন এবং কোন পুরস্কারের আশা করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস এই যে মৃত্যুতে তাঁহাদের

অবসান হয় নাই। তাঁহারা প্রাণ দিয়া যে সত্যের সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহাদের আত্মাকে সেই সত্যের কিরণে বিমণ্ডিত দেখিতে আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে সাধুতাকে তাঁহারা চিরকল্যাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সাধুতার অমৃত যে তাঁহাদের অনন্ত জীবনের অন্ন-পান হইয়াছে,ইহাই আমাদের হৃদয়ের সহজ ধারণা।

বিধাতা স্বহস্তে মানবের ললাটে অনন্ত জীবনের অধিকার লিখিয়া দিয়াছেন। পরলোকে বিশ্বাস মানবের সর্ব্বোচ্চ আশা এবং পরলোকে সন্দেহ মানব-অন্তরে সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার। পাপে অন্ধ হইয়া মানুষ সেই আশায় বঞ্চিত হয় এবং অন্যের অন্তরে তাহাদের অবিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া প্রভূত অনর্থ উৎপাদন করে। যাঁহারা মানবের এই মহীয়সী আশাকে সমুজ্জ্বল করেন এবং মানব-অন্তর হইতে এই অবিশ্বাসের অন্ধকার বিদূরিত করেন তাঁহাদের ন্যায় মানবের পরমবন্ধু আর কে ?

সমাজের উন্নতি।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল এম-এ)

সমাজের সহিত আমাদের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; সমাজের উন্নতি না হলে আমাদের উন্নতি নাই, এ কথা আমরা সকলেই বুঝি। আশানুরূপ সমাজ এগোচ্ছে না; বরং বিপরীত দিকে গতি যাচ্ছে বলে অনেকে অনুযোগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ যে নূতন আদর্শ নিয়ে এসেছিলেন, সে আদর্শ ক্রমে মলিন হয়ে যাচ্ছে ; নানা জনে নানা কারণ নির্দ্দেশ করেন। আমাদের ভাল করে চিন্তা করে দেখা উচিত বাস্তবিক আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায় এবং কি পরিমাণে তাহা পরিহার্য্য।

কিরূপ অবস্থায় থাকলে আমরা বলতে পারি সমাজ বেশ উন্নতিশীল, তাহার বেশ জীবন্ত অবস্থা। বাহিরের দিক দিয়া দেখতে গেলে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে কত লোক সমাজে আছে, এবং নূতন লোক উত্তরোত্তর আসছে কি না। দ্বিতীয়তঃ সমাজের যে আয়োজন ও অনুষ্ঠান, যে ক্রিয়াকলাপ তাহাতে সকলের বেশ আগ্রহ, উৎসাহ ও শ্রদ্ধা আছে কি না। তার পর ভিতরের দিক দেখতে গেলে দেখতে হবে যে, যে আদর্শ লইয়া সমাজ গঠিত হয়েছিল তাহা ক্রমে পুষ্টিলাভ করছে কি না। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সাধন, এবং তাহাদের সমন্বয়, মানুষ ক্রমে ব্রহ্মযোগে লীন হয়ে যাবে ; এক পরমেশ্বরকে লাভ করে সমাজসেবা, নরনারীর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক অধিকার বৃদ্ধির বন্দোবস্ত ; সমাজের নানাবিধ অন্যায় ভেদবিচার রোধ করা ; অখণ্ড বিশ্বে বিশ্বপতির দর্শন এবং তাঁহার বিশ্বকার্য্যে সহযোগী হওয়া। এ তো হল আমাদের বাহিরের এবং ভিতরের কথা।

এখন আলোচনা করে দেখা যাক্ কোন্ দিকের অবস্থা কিরূপ। ব্রাহ্মসমাজ মুষ্টিমেয় নরনারীর সমাজ। সংখ্যায় আমরা নগণ্য। প্রায় একশত বৎসর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল কিন্তু আমাদের সংখ্যা ছয় হাজারের অধিক নয়। নূতন লোক সমাজে বড় আসছে বলে মনে হয় না। সামাজিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজে এসে মিশেন, কিন্তু তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় যোগ দিতে প্রস্তুত নহেন। কেহ বা ব্রাহ্মসমাজের নীতি ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সহানুভূতি প্রকাশ করেন ; তাঁরা সামাজিকতায় এসে যোগ দিতে পারেন না। তাঁরা উপাসনায় আসেন, নীতির পক্ষপাতী, সমস্ত সাধু কার্য্যে তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে সামাজিক সাম্য, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে পশ্চাৎপদ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই একদল আছেন তাঁরা শুধু উপাসনাকে সমাজের কার্য্য মনে করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য উপাসনা, মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জ্জন—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব নহে। মানুষ স্বাধীন ভাবে ভগবানের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে কি সম্বন্ধ না বুঝতে পারলে তার জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অনন্ত ভগবান বিশ্বব্যাপী, তিনি বিশ্বের সকলের সঙ্গে লীলা করছেন ; তাঁর কাছে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ নাই, স্ত্রীপুরুষ সকলেই তাঁর পূজার অধিকারী, এই কথা না বুঝতে পারলে পূজা অপূর্ণ থাকে। তাই ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদের বিরোধী--তাই আমরা স্ত্রী ও পুরুষকে সমাজে সমান স্থান দান করি।*

অনেকে বলেন সংখ্যায় ব্রাহ্মসমাজ বড় না হতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ; খুব কম জ্ঞানী লোক আছেন, যাঁদের পৌত্তলিকতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, যাঁরা জাতিভেদকে অনাবশ্য মনে না করেন। স্ত্রীশিক্ষাকেও অনেকেই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেন। ভাবে এবং চিন্তায় ব্রাহ্মসমাজের অনুবর্ত্তী অনেকে, কিন্তু সামাজিকতায় এগিয়ে আসতে পারছেন না ; কেহ প্রাচীন আচারের বাধ্য, কেহ পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের বাধ্য, আবার কেহ স্বয়ংই পরিবর্ত্তনবিরোধী। নানা শক্তি কাজ করছে। প্রাচীন প্রাচীর ভাঙ্গা বড় সহজ ব্যাপার নয়, অনেক সাহস

* এস্থলে "সমান" শব্দের পরিবর্ত্তে "যথাযথ" শব্দ প্রয়োগ করিলে অধিকতর সঙ্গত হইত। তং সং।

দরকার; সেইজন্য তাঁরা কেবল সামাজিক স্বাধীনতার অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজে মিশতে চান—তাঁহাদিগকে সমাজের বাহিরের লোক মনে করলে বিশেষ লাভ নাই। তাঁরা একদিকে যে সাহস দেখিয়েছেন,—যদি সমাজে আধ্যাত্মিকতার শক্তি থাকে, একদিন না একদিন তাঁদের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করবে; তাঁরা সমাজের সমস্ত সাধু চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হবেন, তাঁরা পরিবারে নীতি এবং ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যগ্র হবেন। সমাজের যাঁরা আধ্যাত্মিক মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁরা যদি বাস্তবিক শক্তিশালী হন, ধর্ম্মের সুনির্ম্মল উৎসের সঙ্গে যদি তাঁদের যথার্থ যোগ থাকে, তাঁরা অপরকে সেই দিকে আকৃষ্ট করতে পারবেন। তবে যদি নিজেদের ভিতরে কিছু না থাকে, তাহলে অপরের সঙ্গে না মিশলে আমাদের যৎটুকু শক্তি থাকে তাহা ক্রমে ক্ষয় হয়ে যাবে। ধর্ম্মসমাজ ধনীকে যদি ধনের মায়া পরিত্যাগ করতে না শিখাল, যদি পাপীকে পাপের আকর্ষণ থেকে উদ্ধার করতে না পারল, যারা ভেসে যাচ্ছে তাদিগকে রক্ষা করতে না পারল, তবে সে সমাজের শক্তি কি? আমরা কি সমাজের ইতিহাসে দেখি নাই মদ্যপায়ী সুরা পরিত্যাগ করেছেন, পাপী পাপ-পথ ছেড়েছেন, চোর দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেছেন, কত জগাই-মাধাই ব্রহ্মনামে ত্রাণ পেয়েছেন? আমরা কি না এখন ভয় পাচ্ছি যে দুজন বাহিরের লোক সমাজের সর্ব্বনাশ করল? আমরা বলতে সাহস পাচ্ছি না যে আমাদের হৃদয়ের তেজ কমে গিয়েছে। সমাজের সংখ্যা বাড়াতে আমরা আনন্দিত না হয়ে ভয় পাচ্ছি? ইহা অপেক্ষা আমাদের দুরবস্থা আর কি হতে পারে?

তার পর আমাদের অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপ। আমাদের প্রধান অনুষ্ঠান সাপ্তাহিক উপাসনা। সর্ব্বত্র শুনা যায় উপাসনায় লোক হয় না। উপাসনায় যেতে কাহারও আগ্রহ নেই। আমাদের পত্রিকায় লেখা হয়, যাঁরা আচার্য্যের কার্য্য করেন তাঁরাও যে দিন অপরে আচার্য্যের কার্য্য করেন সে দিন উপস্থিত হন না। উৎসবের সময় কোন কোন দিন কিছু উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, অপর দিন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কারণ অনুসন্ধান করলে অনেকে বলেন, ঐ শুষ্ক উপাসনায় যেতে ইচ্ছা করে না। সেখানে প্রাণ গলে না। প্রাণমাতান সঙ্গীত নাই, হৃদয়গ্রাহী উপাসনা বা উপদেশ নাই, যদি উপাসনায় গিয়ে শ্রান্তক্লান্ত প্রাণটা আরাম না পেল তাহলে এরূপ নিয়ম বেঁধে নির্দ্দিষ্ট দিনে সমাজে যাওয়ার দরকার কি? কথাটা বাস্তবিক সত্য—উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। মাটির পুতুল ছেড়ে কথার পুতুল গড়ার আবশ্যক কি? আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠান—সঙ্গত, আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি সব উঠে গেছে বল্লে হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম জোয়ারের সময় লোকে কত রাত্রি সঙ্গতে আলোচনায় কাটিয়েছেন, সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে ভোর হয়ে গিয়েছে; এখন অল্প একটু দেরী হলে আহারের সময় বয়ে যায় বলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এ সমস্ত আমাদের দুর্ব্বলতার চিহ্ন। ইহা ছাড়া আমরা দেশের কোন মঙ্গলকার্য্যে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট নই। এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যাকে বলতে পারা যায় বিশেষভাবে ব্রাহ্মপ্রতিষ্ঠান। ব্রাহ্মগণের সংস্পর্শে আসার জন্য লোকে বিশেষ আগ্রহান্বিত নয়।

এ গেল বাহিরের কথা, ভিতরেও আমাদের সে অগ্নি তেমন প্রকাশ পাচ্চে না। ভিতরে আগুন থাকলে তাহা বাহিরে প্রকাশ পেত। জ্বলন্ত আগুন ঘরে চাপা থাকে না। আমাদের মধ্যে কত জন আছেন যাঁরা বলতে পারেন যে, তাঁরা আধ্যাত্মিকতায় ক্রমে উন্নতি লাভ করছেন—তাঁদের চিন্তা, জ্ঞান, কর্ম্ম ভগবৎপ্রেরণাসম্ভূত। এ যদি না হতে পারল আমাদের সব সাধনা যে বৃথা। আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ জীবনের সব বিভাগে। প্রথমতঃ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। দেখতে হবে, সমস্ত রিপু আমার অধীন কি না, আমি রাগ ঘৃণা দ্বেষ সমস্ত পরিত্যাগ করেছি কি না, কর্ম্মের ফলাফলের উপর আমি নির্ভর না করে কার্য্য করতে শিখেছি কি না, সর্ব্ব জীবে আমার প্রেম জন্মেছে কি না? আমি দিনরাত উপাসনা করছি অথচ রিপু সংযত নয়, সেখানে উপাসনা হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজে অনেকে হয় ত আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয়েছেন; কিন্তু সাধারণ ধারণা, সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা তেমন বাড়ছে না।*

* লেখক ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী। তাঁহার মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও তাঁহার বক্তব্যগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মের চিন্তার বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তং সং

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ভৈরবী—তাল দাদ্‌রা।

বাঁশরী মরমে আজ বাজিছে তোমারি—
লভি' সমাধি ভুলিনু হে সবি আপনারি।
পেলে তোমারে চাহিনাকো বেদ সাঙ্গ চারি;
তব নামে আনন্দ জাগে হৃদয়ে আমারি।
সাথে তব রহিবারে চাহি সব ছাড়ি'।
পরাণে আজি উজান বহে জীবনকাণ্ডারী!
গগনাঙ্গনে নব নব হে ত্রিলোকধারী
রূপ তব অবাক হেরে যতেক নরনারী।
সুন্দর তুমি মনোহর বরিষ প্রেমবারি—
ধরি তোমার কলুষহরণ চরণ সুখকারী॥

কথা:—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সুর—সুরকিশোর।

স্বরলিপি:—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ ০ ১´ ০ ১´
II { পা -া পা। দা -া পা। মা পা মা। জ্ঞা রা জ্ঞা। সা ঋা ণ্া।
বাঁ ০ শ রী ০ ম র ০ মে আ ০ জ বা ০ জি

০ ১´ ০ ‖ ১´ ০
। সা ঋা মা। জ্ঞরা জ্ঞা ঋা। সা -া -া }। র্সা দা দা। পা -া পা।
ছে ০ তো মা০ ০ ০ রি ০ ০ ল ভি স মা ০ ধি

১´ ০ ১´ ০ ১´
। দা র্সা ণদা। ণা দা পা। জ্ঞা পা দা। ণা দা পা। মা জ্ঞা মা।
ভু ০ লি০ মু ০ হে স ০ বি আ ০ প না ০ ০

০
। জ্ঞা রা জ্ঞা II
রি ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´
II { দা -া মা। দা দা ণা। র্সা -া র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্ঋা র্জ্ঞা।
(১) পে ০ লে তো মা রে চা ০ হি না ০ কো বে ০ দ
(২) সা ০ থে ত ০ ব র ০ হি বা ০ রে চা ০ হি
(৩) গ ০ গ না ঙ্গ নে ন ০ ব ন ০ ব হে ০ ত্রি
(৪) সু ০ ন্দ র তু মি ম ০ নো হ ০ র ব রি ষ

০ ১´ ০ ১´ ০
। র্ঋা -া র্সা। ণদা ণা দা। পা -া -া }। জ্ঞা পা পা। পা -া পা।
(১) সা ০ ঙ্গ চা০ ০ ০ রি ০ ০ ত ব না মে ০ আ
(২) স ০ ব ছা ০ ০ ড়ি ০ ০ প রা ণে আ ০ জি
(৩) লো ০ ক ধা০ ০ ০ রী ০ ০ রূ প ত ব ০ অ
(৪) প্রে ০ ম বা০ ০ ০ রি ০ ০ ধ রি তো মা ০ র

১´ ০ ১´ ০ ১´
। দা র্সা ণদা। ণা দা পা। জ্ঞা -া পা। দা -া পা। মা জ্ঞা মা।
(১) ন ০ ন্দ০ ০ জা গে হৃ ০ দ য়ে ০ আ মা ০ ০
(২) উ জা ন০ ০ ব হে জী ০ ব ন ০ কা ঙা ০ ০
(৩) বা ০ ক হে রে য তে ক ন ০ র না ০ ০
(৪) ক লু ষ হ র ণ চ র ণ সু ০ থ কা ০ ০

০
। জ্ঞা রা জ্ঞা II II
(১) রি ০ ০
(২) রী ০ ০
(৩) রী ০ ০
(৪) রী ০ ০

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল গীতাঙ্গী।

অরূপেরি রূপ হেরে এই
ফেরে না আঁখি
মনে লাগে সারাজীবন
তাকায়েই থাকি।
কি যে শুভ্র সুনীল আকাশ
কি যে গন্ধ মধুর বাতাস
কি বিচিত্র ফুলের বিকাশ
লক্ষ বরণ পাখী।

মনে লাগে এমনিতরই
থাকি চাহিয়া
আর চেয়েচেয়েই যুগযুগান্ত
যাউক বাহিয়া।
আকাশভরা দৃষ্টি তাঁহার
ছলাক্ যত গীতি হিয়ার—
আনন্দে গাই—শোনাই তাঁরে
ঐ চোখে চোখ রাখি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { জ্ঞা জ্ঞা -াম । জ্ঞা -রা । জ্ঞা -মা I জ্ঞা -া ঋা । সা -াণ । দা ণা I
অ রূ • পে • রি • রূ প্ হে রে • এ ই

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -ঋা । মজ্ঞা -া । ঋা -জ্ঞা I সা -া -া । -া -া । -া -া } I
ফে রে • না • আঁ • থি • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ণা সা -দা । দা -া । দা -া I পা পা -া । দপা -মজ্ঞা । রা -া I
ম নে • লা • গে • সা রা • জী• •• ব ন্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা পা -াম । মা -ণা । দা -পা I মা -া -া । -া -া । -া -া II
তা কা • য়ে ই থা • কি • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা -দা দা । দা -া । দা -ণা I ণা র্সা -া । ণা -র্সা । র্সা -া I
কি • যে শু • ভ্র • সু নী ল্ আ • কা শ্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া I র্মা র্জ্ঞা -া । র্ঋা -া । র্সা -া I
কি • যে গ ন্ ধ • ম ধু র্ বা • তা স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -া পা । পা -া । পা -দা I ণা দণা -া । দা -া । পা -া I
কি • সু গ ন্ ধ • ফু লে র্ বি • কা শ্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -ণা ণা । দা -া । দপা -মা I জ্ঞা মা -া । -া -া । -া -া II
ল • ক্ষ ব • র• ণ্ পা খী • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
[মা মা]
II { সা সা -া। সা -া। সা -ঋা I জ্ঞা -মা মা। মা -া। মা -দা I
ম নে • লা • গে • এ ম্ নি ত • র ই

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ^দমা মা -া। মা -মা। -া জ্ঞা I মা -া -া। -া -া। -া মা I
থা কি • চা • • ছি য়া • • • • • আর

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা -ঋা। জ্ঞা -া^ঋ। জ্ঞা -মা I জ্ঞা -া ঋা। সা -া। ^দদা -ণা I
চে য়ে • চে • য়ে ই যু গ্ যু গা ন্ ত •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -ঋা। মা -জ্ঞা। ঋা -জ্ঞা I সা -া -া। -া -া। -া -া } II
যা উ ক্ বা • হি • য়া • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { মা দা -া। দা -া। দা -ণা I ণা -র্সা র্সা। ণা -র্সা। র্সা -া I
আ কা শ্ ভ • রা • দৃ ষ্ টি তা • হা র্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋা। র্জ্ঞা -র্ঋা। র্জ্ঞা -র্মা I ^র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া। র্ঋা -া। র্সা -া } I
ছ লা ক্ য • ত • গী তি • হি • য়া র্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -পা। পা -া। পা -দা I ণা ^দণা -া। দা -া। পা -া I
আ ন ম্ দে • গা ই শো না ই তাঁ • রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা -ণা ণা। দা -া। দপা -মা I মা মা -া। -া -া। -া -া II II
ঐ • চো খে • চো• খ্ রা খি • • • • •

—•—

শকুন্তলা (পঞ্চমাঙ্ক)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

শকুন্তলা এতদিন রাজাকে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া আসিতেছিলেন। সেকালে স্ত্রী স্বামীর প্রতি ঐ সম্বোধনসূচক বাক্য ব্যবহার করিতেন। যখন শকুন্তলা দেখিলেন যে, রাজা তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তিনি ঐ সম্বন্ধসূচক বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'আর্য্য' এই কথাটি ব্যবহার করিলেন।

"অজ্জস্য পরিণয়ে এব্ব সন্দেহো।
কুদো দাণিং মে দূরাহিরোহিণী আসা॥"

বাক্যটি জনান্তিকে প্রয়োগ হইয়াছে। এ স্থলেও অতটা সাবধান কিংবা হিসাব করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু শকুন্তলার শিক্ষাই ঐরূপ উচ্চ অঙ্গের ছিল। সে শিক্ষা কখনও মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে দিত না।

শকুন্তলা নীরব রহিলেন। শার্ঙ্গরব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ব্রহ্মতেজ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রাজাকে আর ক্ষমা করিতে পারিলেন না। রাজার এই ব্যবহার তাঁহার গুরুর প্রতি

বিশেষ অসম্মান প্রদর্শন,—তাঁহাকে বিশেষরূপে অপমানিত করা; ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? তাই তিনি বলিলেন—

"মা তাবৎ"—গ্রহণ করিও না। আবার বলিলেন,—'তুমি তাঁহার কন্যার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছ, ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষসহকারে তোমার এই কার্য্যে অনুমোদন করিয়াছেন। তুমি দস্যুর মত তাঁহার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছ, মুনি তোমাকে দানপাত্র নির্ব্বাচন করিয়া সেই অপহৃত সম্পত্তি তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছেন। এমন ব্যক্তিকে তোমার অপমান করাই উচিত!'

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা কাজের লোক। তিনি দেখিলেন যে, এই বাক্‌বিতণ্ডা, রাগারাগিতে কোন ফল নাই; তাই তিনি শার্ঙ্গরবকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—"শকুন্তলে! আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। রাজা এইরূপ বলিলেন, এক্ষণে তাঁহার যাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে এরূপ উত্তর দাও।"

শকুন্তলা মনে মনে বলিলেন—"এত ভালবাসা যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন স্মরণ করাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বৃথা; তবে এক্ষণে আমার আত্মা কলঙ্কে কলুষিত না থাকে সেজন্য বলিতেছি।" তিনি প্রকাশ্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিতে গিয়া অভ্যাসবশতঃ একটা ভ্রমে পড়িলেন—'আর্য্যপুত্র!' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কিন্তু তখনি তাঁহার মনে পড়িল, এরূপ সম্বোধন আর উচিত নয়। তাই তিনি বলিলেন—'পরিণয়ে যখন সংশয় তখন আর এরূপ আচরণ উপযুক্ত নহে।' এই বলিয়া তিনি শুধরাইয়া বলিলেন—'পৌরব! এই কি উচিত? পূর্ব্বে আশ্রমে এই স্বভাবতঃ সরলহৃদয় ব্যক্তিকে ঐ প্রকারে শপথ আদি দ্বারা বঞ্চিত করিয়া সম্প্রতি তাহাকে এই সকল বাক্যে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন?' শকুন্তলা আর কি বলিতে পারেন? তাঁহার হৃদয়ের গভীর দুঃখ ঐ কয়েকটি কথা দ্বারা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার সরল হৃদয়ের ভাব ঐরূপ সরল বাক্যেই ব্যক্ত হইবে। এস্থলে বাক্‌চাতুর্য্য কি বাগাড়ম্বর থাকিতে পারে না। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, কথা কি তাঁহার আছে?—কথা থাকিতে পারে না। মুখ বন্ধ হয়,—হৃদয় বলিতে থাকে।

কবি শকুন্তলার মুখে ভ্রমক্রমে "আর্য্যপুত্র" এই কথাটি উচ্চারণ করাইয়া দেখাইতেছেন যে, শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মধ্যে প্রণয় এতই গাঢ় হইয়াছিল এবং শকুন্তলা দুষ্মন্তকে আর্য্যপুত্র বলিয়া এতবার সম্বোধন করিয়াছিলেন যে, বিশেষ সাবধান হইয়া কথাবার্ত্তা কহা সত্বেও সেই অভ্যাসবশত একটি ভ্রম অনিবার্য্য হইয়াছিল।

রাজা শকুন্তলার কথা শুনিয়া কাণে হাত দিলেন ও বলিলেন—"ও পাপকথা মুখে আনিও না। নদী যেমন পাড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া নিজের জলকে আবিল করে এবং তট-তরুকে পাতিত করে, তেমনি তুমি কেন নিজের কুলকে কলুষিত করিতেছ এবং আমাকে পাতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ?"

এই কথায় রাজা শকুন্তলাকে দুশ্চারিণী কুলকলঙ্কিনী বলিতেছেন—শকুন্তলা নিজের দুষ্কৃতি দ্বারা নিজের কুলকে কলঙ্কিত করিয়াছেন এবং এক্ষণে রাজাকেও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিবার চেষ্টায় আছেন। গুরুতর অভিযোগ। সতী সাধ্বী তপস্বী-কন্যার পক্ষে ইহা অতি অসহনীয় বাক্য। শকুন্তলা বুক বাঁধিয়া ইহাও সহ্য করিলেন। তিনি এবারে 'অভিজ্ঞান' দেখাইয়া রাজার মনের আশঙ্কা অপনোদনের চেষ্টা করিলেন। আসিবার সময় প্রিয় সখীদ্বয় বলিয়াছিল—'যদি রাজার স্মরণ হইতে বিলম্ব হয়, তবে রাজার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি দেখাইবে।'

শকুন্তলা রাজাকে বলিলেন—"যদি সত্যসত্যই পরিণয় বিষয়ে সন্দেহ হইয়া তোমার এরূপ মনের ভাব হইয়া থাকে, তবে এই অভিজ্ঞান দেখাইয়া আমি তোমার আশঙ্কা নিবারণ করিতেছি।"

রাজা বলিলেন—এ ভাল কথা।

শকুন্তলা রাজার ঐ কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রাজার দত্ত তাঁহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি অঙ্গুলি হইতে খুলিতে গিয়া দেখিলেন অঙ্গুরী নাই। কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। তপোবন পরিত্যাগ করা অবধি শকুন্তলার মন স্থির ছিল না। একদিকে গুরুজন ও তপোবন পরিত্যাগ, অপর দিকে রাজ-

কুলে যাইতেছেন—এক নব জীবন, কি জানি কি হয়; এই সকল সমস্যা তাঁহার মনকে তোলপাড় করিয়াছিল; কাজেই অঙ্গুরীটি যে কখন্ হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে শকুন্তলা তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে অঙ্গুরী না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। হায়! হায়! বলিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন—"অঙ্গুলি অঙ্গুরীশূন্য হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া শকুন্তলা হতাশ অন্তঃকরণে সবিষাদে গৌতমীর মুখপানে চাহিলেন। আর কি করিবেন? বিপদে পড়িলে আমরা সকলেই ঐরূপ পিতামাতা গুরুজনের মুখপানে চাহিয়া থাকি।

গৌতমী ধীরা। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার সন্তানস্নেহ। অনভিজ্ঞ গুরুজন এরূপ স্থলে সন্তানের অসাবধানতার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কদাচ করেন না। গৌতমীও তাহা করেন নাই। তিনি শকুন্তলার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অঙ্গুরীটি যে হারাইয়াছে তাহার একটী কারণ অনুমান করিয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়ই শক্রাবতার মধ্যে শচীতীর্থজলে জলাঞ্জলি দিয়া পূজা করিবার সময় অঙ্গুরীটি পড়িয়া গিয়াছে। অনুমান যুক্তিযুক্ত। কিন্তু রাজা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। হায় রে কুটিল রাজনীতি! বিচারাসনে বসিয়া রাজা প্রতিদিন সত্য-মিথ্যা নানা কথা শুনেন; মনুষ্যচরিত্রের যত দূর মন্দ সম্ভব সমস্তই দেখিতে পান। ঐরূপ দেখিয়া দেখিয়া অন্তঃকরণ কঠোর হইয়া পড়ে—সরলভাবে কোন বিষয়ই গ্রহণ করিতে পারে না। প্রত্যেক বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হয়। কোন লোককে সহজে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রথমত কাহাকেও ভাল মনে করিতে পারে না। সকলকে মন্দই মনে করে। প্রমাণের দ্বারা যে আপনাকে ভাল সাব্যস্ত করিতে পারে সে-ই ভাল—আর সকলে মন্দ। কুটিল রাজনীতির অনুগামী রাজা দুষ্মন্তও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, রাজা দুষ্মন্ত এই সরলপ্রাণা প্রবীণা ঋষিকন্যা গৌতমীকেও সুচক্ষে দেখিতে সক্ষম হন নাই।

সংসারক্ষেত্র অতি ভয়ঙ্কর স্থান। এ স্থানে বিচরণ করিতে করিতে মানুষের মহত্ত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ পায়; সরল প্রাণ, সরল ভাব, সরল বিশ্বাস এ সকল কিছুই থাকে না। কি দুঃখের কথা, রাজা গৌতমীর ঐ বাক্যটাকে চাতুরীপূর্ণ মনে করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"লোকে যে বলে স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতি—তাহা এই"।

রাজার অভিপ্রায় এই যে, গৌতমী যে অঙ্গুরী হারাইয়া যাওয়ার বৃত্তান্তটি বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা—গৌতমীর কল্পিত। গৌতমী ইহাতে বেশ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছেন। কি দুঃখের কথা!

শকুন্তলা গৌতমীর প্রতি দুষ্মন্তের এই তীব্র বাক্য-প্রয়োগটি শুনিতে পান নাই। তিনি অঙ্গুরী হারাইয়া এক রকম হতজ্ঞান হইয়া বিধাতার বিষম বিড়ম্বনার কথা ভাবিতেছিলেন। বিধি তাঁহাকে বিষম বিড়ম্বনায় ফেলিয়াছেন। যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব সমস্তই ঘটিবার যোগাড় হইয়াছে। এ অবস্থায় মানুষের যে কি অবস্থা ঘটে পাঠক তাহা অনুমান করিবেন। শকুন্তলা দুঃখিতা হইয়া বলিলেন—"বিধাতা ইহাতেও প্রভুত্ব দেখাইলেন; যাহা হউক অন্য কথা তোমাকে বলিতেছি।"

রাজার মনে প্রকৃতই অবিশ্বাস আসিয়াছে। তিনি শকুন্তলার প্রতি কিছুতেই সহানুভূতি করিতে পারিলেন না; পক্ষান্তরে বক্রোক্তিতে বলিলেন—"এবারে আমার শুনিবার পালা।" অর্থাৎ দেখা শেষ হইয়াছে, এবারে শুনিতে হইবে। হায়! হায়! ঐ অবলা সরলার প্রাণে যেন এক-একটি কুঠারের আঘাত পড়িতেছে।

শকুন্তলা এই বক্রোক্তিতে বিচলিত না হইয়া সরল ভাবে বলিতে লাগিলেন। "একদিন বেতসলতামণ্ডপে পদ্মের পাতার ঠোঙা করিয়া খানিকটা জল তুমি হাতে করিয়া রাখিয়াছিলে।"

রাজা বলিলেন—"হাঁ শুনছি, তার পর?"

শকুন্তলা বলিতে লাগিলেন—"ঠিক সেই সময় আমি যাহাকে ছেলে বলিয়া ডাকি, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে সেই মৃগশাবকটি উপস্থিত হইয়াছিল। 'এই প্রথমে পান করুক' এই বলিয়া তুমি আদর করিয়া জলপান করিতে বলিলে; কিন্তু অপরিচিত বলিয়া তোমার হাতের নিকটে সে আসিল না। পরে আমি যখন সেই ঠোঙাটিতে জল ধরিলাম তখন সে

পান করিল। তুমি তখন উপহাস করিয়া বলিয়াছিলে যে আপন আপন জাতিকে সকলে বিশ্বাস করে। তোমরা দুজনেই অরণ্যবাসী।”

এ সকল প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর ভিতরকার অতি গুহ্য কথা। অন্যে ইহা জানিতে পারে না। এরূপ অতি স্বাভাবিক একটি কথোপকথন হঠাৎ কল্পনা করিয়া বলাও শকুন্তলার পক্ষে তখন সহজ ছিল না। একজন কবি এরূপে একথা কল্পনা করিতে পারেন বটে—কেন না, এরূপ পারেন বলিয়াই তিনি কবি। তুমি আমি কি পারি? শকুন্তলা সেই সময় যে অবস্থায় রাজসমীপে দণ্ডায়মান তাহা সকলেই জানেন, ঐ সময়ে ঐরূপ একটা কাল্পনিক উপাখ্যান রচনা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। রাজার বিশ্বাস করা উচিত ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, রাজার ইহাতেও বিশ্বাস হইল না। কূট রাজনীতি তাঁহাকে অন্য দিকে লইয়া গেল। তিনি সত্যসত্যই উপাখ্যানটিকে একটি চাতুরীপূর্ণ কল্পিত উপাখ্যান মনে করিয়া, শকুন্তলা যে তাঁহাকে ছলনা করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন—“এইরূপে আত্মকার্য্য উদ্ধারের জন্য ললনাগণ মধুর ও অমৃতময় বাক্য দ্বারা বিষয়ীদের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে।”

রাজা শকুন্তলার প্রতি এই কঠোর উক্তিটি করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শকুন্তলার দিক দিয়া দেখিলে রাজাকে অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্ম্মম এবং অতিশয় কলুষিত-অন্তঃকরণ বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু পাঠক! এ স্থলে রাজার অবস্থাটা ভুলিয়া যাইবেন না। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা! অধর্ম্মের শাসন—ধর্ম্মের রক্ষণ তাঁহার কার্য্য। শকুন্তলার মত দেবীতুল্যা রমণী কয়জন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়? সেরূপ রমণীই বা কয়জন আছে? সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ঐরূপ প্রতারণাদির অভাব নাই। এই সকল অনবরত দেখিয়া দেখিয়া রাজার চিত্তবৃত্তিও ঐরূপ হইয়াছে। বিশেষতঃ তিনি ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া একটি আসন্নসত্ত্বা রমণীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিবেন অথচ তাঁহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র স্মরণ নাই? এস্থলে সূক্ষ্ম বিচার যে নিতান্ত প্রয়োজন সে, বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অন্ন-ব্রহ্ম সমাধান।

(শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য)

আমরা এখন চাই কি? আমরা চাই মুক্তিপথ। এই মুক্তির পথ কি? আমাদের জাতীয় একতা। জাতীয় একতা কোন্ পথ দিয়া গেলে লাভ করিতে পারি এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান ভারতে সকল দিকে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। কেহ বলেন ধর্ম্ম দ্বারা, কেহ বলেন সমাজ সংস্কার করিয়া; আর একশ্রেণীর লোক স্থির করিতেছেন, রাজনীতি সংস্কার বিনা কোন পথই আমাদিগকে দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। ভারতে প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুর আচারব্যবহার প্রত্যেক প্রদেশ হইতে যেমন অসমঞ্জস ভাবে পৃথক্ তাহাতে বুঝা যায়, হিন্দু যেন একটী জাতি নহে; আবার প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাও পরস্পর হইতে পৃথক। এই অবস্থায় গভীর চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে—আমাদের একতা হয় কি প্রকারে। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন যে রাজনৈতিক দিক দিয়া একতা আনয়ন করিতে না পারিলে ভারতের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে একতা কিছুতেই আনিতে পারা যাইবে না। তাঁহাদের মতে প্রাচীন কাল হইতে আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে যুগ-সংস্কারবিরোধী যে সকল সঞ্চিত আবর্জ্জনা আছে আইন করিয়া তাহা উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই যখন আমাদের হাতে আসিবে, তখন আমরা সহজে তাহা তাড়াইয়া দিতে পারিব; সে সময় ভারতের জাতীয় একতা অতি সহজ হইয়া পড়িবে। স্বরাজ যাহা, রূপান্তর ভাবে দেখিতে গেলে জাতীয় একতাও সেই একই বস্তু। এখন বিবেচনা করিতে হইতেছে, স্বরাজ ভিতরের জিনিষ কি বাহিরের জিনিষ? স্বাধীনতা আর স্বরাজ এক অর্থ নয়; মহাত্মা গান্ধী স্বরাজকে ধর্ম্মরাজ্য আখ্যা দিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যায়, ধর্ম্মরাজ্য বা স্বরাজের মূল সাম্যবাদ। ভাগবত-শাস্ত্রমতে মানুষ নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের বন্ধু। এই কথার দ্বারা ইহাই পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি হয় যে, মানুষ যখন নিজেকে নিজে শাসন করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তখন স্বাধীনতা হারাইয়া সে পরাধীন হয়। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে ভগবান মানুষকে স্বাধীন জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতার দোষে মানুষ কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ আদি ইন্দ্রিয়জনিত বিকারের অধীন হইয়া পরাধীন হয়।

মূলে ধর্ম্ম না থাকিলে আর ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা ভাল করিয়া জানিতে না পারিলে জাতির মধ্যে স্বরাজ

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব পর নহে। প্রায় দু'হাজার বৎসর হইতে আমরা হিন্দুজাতি ধর্ম্মের অর্থ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া এমন ভাবে ধর্ম্মকে হারাইয়া ফেলিয়াছি যে, মূলত ইহারই জন্য আমরা পরাধীন জাতি হইয়া পড়িয়াছি।

ধর্ম্মের মূল অর্থ, যাহা ধরে বা ধারণ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম অর্থে একাধারে সব দিক্ রক্ষা করার কারণকেই (Protective cause) বুঝায়। আগে শরীর রক্ষা, পরে ধর্ম্মের কথা; শরীররক্ষাও ধর্ম্মের বাহিরে নয়। এই শরীরটী প্রকৃত পক্ষে যন্ত্র বা ইঞ্জিন। ইঞ্জিনকে যেমন ড্রাইভার চালায়, আমার দেহরূপ ইঞ্জিনটীকেও তেমনই "আমি" নামে যে ড্রাইভারটী আছেন তিনি চালান। ইঞ্জিনের গতিক্রিয়া রক্ষা করিতে যেমন আগুন ধরাইতে কয়লার প্রয়োজন এবং উত্তাপকে পরিমিত বা নিয়মিত করিয়া রাখিতে জলের আবশ্যক, তদ্রূপ দেহ-ইঞ্জিনটীর পক্ষেও শাকান্ন এবং জলের প্রয়োজন। কয়লা দগ্ধ হইয়া গেলে এবং জল উত্তাপের দ্বারা শুষ্ক অথবা বাসি হইলে যেমন ইঞ্জিনের ড্রাইভার বহির্দ্বার-দুটী দিয়া ভস্মাবশিষ্ট কয়লা ও বাসি জল ফেলিয়া দেয়, আমার "আমি" নামক দেহ-ইঞ্জিনের ড্রাইভারটীও তেমনই শাকান্ন ও জল জীর্ণ করিয়া মলমূত্ররূপে বাহির করিয়া দেয়। ইঞ্জিনে জল-কয়লা কমিয়া গেলে ড্রাইভার যেমন উহা পূর্ণ রাখিতে ব্যস্ত হয়, আমাদের দেহের মালিক "আমি" নামক ড্রাইভারটীও তেমনই ক্ষুধা-পিপাসা দ্বারা সংবাদ দিয়া দেহাগ্নি নিবিয়া যাইবার ভয়ে অস্থির হইয়া পড়েন। অন্ন-জল দ্বারা দেহ পূর্ণ করিতে না পারিলে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি কিছুরই সাধনা বা উন্নতি হইতে পারে না। উপনিষদে দেখা যায়, এক সময় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ সম্বন্ধে বিচারকালীন একজন ঋষি বলিয়াছিলেন, অন্নই ব্রহ্ম। কথাটীর গভীর তত্ত্ববিচার করিতে গেলে একেবারে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন ব্রহ্মেরই সৃষ্টি, তখন তাহা হইতে অন্নকে বাদ দিতে পারা যায় না।

জানা যায় যে শাক, ওষধি, ঘাস আদি পদার্থ হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়। ভগবানের বিধান—যাহাকে প্রকৃতি বলে—অতিশয় বিস্ময়জনক। প্রকৃতির সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম হইতে এই দৃশ্যমান বৃহৎ জগতের সৃষ্টি অতীব বিস্ময়জনক। আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, সংবর্ত্তন আর পরিণাম এই চারি প্রকার সৃষ্টি-বিধান-রহস্য, যাহাকে রূপক ভাবে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ বলে; এই চতুর্ভুজেই সৃষ্টি অবিরাম গড়ে আর ভাঙ্গিয়া থাকে। বিষ্ণুর এই চারিখানি হাতের মধ্যে বিবর্ত্তনরহস্য-হাতখানি অতীব চমৎকার। এই হাতের দ্বারা কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উচ্চ জীব ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব দেখা যায়, অন্নব্রহ্ম হইতে মূলতঃ জীবের সৃষ্টি। তাহা হইলে উপনিষদের ঋষি যে বলিয়াছেন—'অন্নই ব্রহ্ম', একভাবে ঠিকই বলিয়াছেন।

প্রথমে অন্নব্রহ্মের আরাধনা করিতে না পারিলে কোন বিষয়েরই আরাধনা সিদ্ধ হয় না। বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুজাতি অন্নব্রহ্মের আরাধনার ত্রুটী করায় ঘোর অধঃপতন অবস্থায় পড়িয়াছে। বৈদিক যুগের আর্য্যেরা খুব কায়িক পরিশ্রম করিতেন। রাজা, ঋষি, ইতর, ভদ্র কেহই হলচালন ও গোচারণ করিতে লজ্জা বোধ করিত না, আর যে-সে কায করিলে তাহাদের জাতিও যাইত না। রাজর্ষি জনক নিজে হলচালন করিয়াছিলেন। বিপ্রদামোদরের সম্বাদে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কাজই করিতে বাকী রাখেন নাই। সে কালের ঋষিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানে এক-একটী আশ্রম খুলিয়া বিদ্যাপীঠ স্থাপনপূর্ব্বক হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন; তাঁহারা নিশ্চয়ই বায়ুভক্ষণ করিয়া সে কায করিতেন না। সুস্নিগ্ধ জলবাহিনী নদীসকলের ধারে, যেখানে প্রকৃতির রম্যকানন মনকে মুগ্ধ করে, ঋষিরা সেই সেই স্থানে প্রশস্ত উর্ব্বর জমি লইয়া আশ্রম স্থাপন করিতেন; সেই সকল আশ্রমই বিদ্যাপীঠ। সেখানে হাজার হাজার শিষ্যেরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ শিক্ষা লাভ করিত। সেখানে রাজকুমার আর গরিবের ছেলের কোনই বিভিন্নতা থাকিত না। গুহক চণ্ডাল আর শ্রীরামচন্দ্র উভয়ে যেমন বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একত্র ভোজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজকুমার আর চাণ্ডালের ছেলে পর্য্যন্ত একত্র আহার-বিহার করিত। কেবল ঋষি এবং ক্ষত্রিয় সন্তানেরাই যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এমন নয়—অনার্য্য জাতির সন্তানেরাও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইত। সেকালে বিনা পরীক্ষায় কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারিত না। সৎশিক্ষা দ্বারা সদাচারী হইলে অনার্য্যদিগকেও আর্য্য-শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইত। সে সকল আশ্রমে বিশেষভাবে কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। আগে অন্নব্রহ্মকে কি প্রকারে আরাধনা করা যায় এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহার যেমন গুণ সেই গুণ অনুসারে শিক্ষা দান হইত। সেখানে গোরক্ষা, গোচারণ, হলচালন আদি কৃষিবিদ্যার শিক্ষাও রাজকুমার হইতে ইতর সন্তান পর্য্যন্ত সকলেরই বাধ্যতামূলক ছিল। এক এক আশ্রমে শস্য, দুগ্ধ ঘৃত, ফল মূল আদি আহার্য্য সকল এমন ভাণ্ডারপূর্ণ থাকিত যে, কোন কোন সময় এক-এক রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া সেখানে সসৈন্যে ভোজন করিয়া এমন তৃপ্তি লাভ করিতেন যে, তেমন তৃপ্তিকর আহার

তিনি কোন দিন নিজ নগরেও করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমানে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া গেছে, হিন্দু ধর্ম্ম গেল বলিয়া আমরা যে চীৎকার করিয়া মরি,—বৈদিক যুগের মত হিন্দু হইতে চেষ্টা করি না কেন? তাঁহারা আমাদের মত ধর্ম্মের দোকান সাজাইয়া বসিয়া বসিয়া খাইতেন না। তাঁহারা হাল কোদাল চালাইতেন; উহাতে তাঁহারা ছোট হইতেন না বা জাতিও যাইত না। সে কালে যাঁহারা চাষ আবাদ করিতেন তাঁহারা সমাজে বর্ত্তমান যুগের ইওরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি সুসভ্য দেশের লোকের মত, সম্ভ্রমশালী লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, নহিলে রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতেন কেন? ভারতের উর্ব্বর জমির প্রতি সেকালের আর্য্যদের মমতা ছিল বলিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহারা দেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন; কারণ জমির প্রতি স্নেহ জমির ব্যবহার না জানিলে থাকা অসম্ভব। যে অবধি চাষা শব্দ হেয় ভাবে গালিরূপে ব্যবহার হইতে লাগিল তখন হইতেই দেশপ্রেম জিনিষটী আমাদের মন হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল। ভদ্রলোক হইবার জন্য অল্প ধনবান হইলেই আমরা চাষের কার্য্য ছাড়িয়া দিই।

অনেক কারণের মধ্যে ভারতবর্ষ পরাধীন হওয়ার একটী মুল কারণ এই যে, এদেশে সংখ্যাতীত বিঘা উর্ব্বরা জমি আবাদ বিনা পতিত হইয়া রহিল; কারণ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিজে চাষ করা অপমান বোধ করিল। ধর্ম্ম বলিয়া একটি জিনিষ ব্রাহ্মণের হাতে রহিল; তাই দিয়া কয়েক কোটী ব্রাহ্মণ নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল। অপর উচ্চ বর্ণ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিরাও ব্রাহ্মণের আদর্শ ধরিয়া অন্যান্য প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া অজ্ঞান প্রকৃতিপুঞ্জের পরিশ্রমের ভাগ আদায় করতঃ জীবিকা চালাইতে লাগিল; ইহারাও সংখ্যায় কয়েক কোটী। তাহার পর এক শ্রেণী লোক, মূর্খ হইলেও অজ্ঞান প্রকৃতিপুঞ্জের উপর পুরুষানুক্রমে গুরু-পুরোহিত হইয়া বসিল। ইহারাও চাষ-আবাদের কোন ধার ধারে না। বৌদ্ধযুগে যে ভিক্ষুসঙ্ঘ সৃষ্টি হইয়াছিল, পরিণামে শঙ্করাচার্য্যের দিন হইতে যে অসংখ্য গঞ্জিকাসেবী সন্ন্যাসী সৃষ্টি হইল, উভয়কে একত্রিত করিলে সংখ্যায় কোটীর কম হইবে না; ইহার পরে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আদি অনেক যোগী, তপস্বী, স্বামী-নামধারী নরনারী ইত্যাদি ভিক্ষু শ্রেণীকেও একত্র করিলে সংখ্যায় কম হইবে না; ইহারা সকলেই চাষাদের উপর ভিক্ষাস্বরূপ ট্যাক্স আদায় করে। সকলকে মিলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে চাষ করিয়া ক্ষুধায় মরে চাষা, বসে অন্ন খায় অপরে। এইরূপ অবস্থায় দেখা যায় বাইশ কোটী হিন্দুর মধ্যে বোধ হয় চাষ-আবাদকরী ছোটলোকের (?) সংখ্যা নিতান্ত কম। এ ভারত দরিদ্র দেশ না হইয়া কোন্ দেশ হইবে? এ ভারতের অনাবাদী জঙ্গলা জমি কোটী কোটী বিঘা না থাকিয়া কোন্ দেশের থাকিবে? এই প্রকার পতিত (waste lands) বিনা-আবাদী জমী, যে দেশে পড়িয়া থাকে সেই দেশই ত বিদেশীকে আহ্বান করিয়া আনে। কারণ জমিই সম্পত্তি, জমিই টাকা, জমিই ঐশ্বর্য্য বিভব।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, দেহস্বরূপ ইঞ্জিনটী অন্নরূপ কয়লা দ্বারা চালিত। ইহার কয়লা কম পড়িলে বা ঠিক নিয়মমত ইহাতে কয়লা দিয়া ষ্টীম রক্ষা করিতে না পারিলে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে যে তাহাতে আর ভুল নাই; সেই অবস্থায় "আমি" নামক ড্রাইভারের ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না। বর্ত্তমান ভারতে অন্নচিন্তা লইয়া সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জাতীয় একতা হওয়া সম্ভবপর নহে। আমেরিকা অতুল বিভবশালী হইয়া উঠিল অপর্য্যাপ্ত মাটীর দরুণই। ভারতে অপর্য্যাপ্ত উর্ব্বরা জমি এপর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে পড়িয়া থাকা সত্বেও আমরা দরিদ্র—আমাদের অন্ন অনাটন। আমরা চাই ধর্ম্ম, ইহসংসার মিথ্যা—পরকালের মুক্তি। ইহ-সংসারেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে পরকালের মুক্তি-পথ খুলিবে কিরূপে? যে জীব অন্নব্রহ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া বিবর্ত্তন-ক্রিয়ারহস্য মতে মানুষ হইয়াছে, মূলে সে অন্নব্রহ্মের সাধনা ব্যতীত কি মানুষ হইতে পারে? জীবের জন্ম হওয়ার বহু পূর্ব্বে যে ফল মূল ধান্য শাকসজী প্রভৃতি জীবের খাদ্য ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আদিমকালে আমরা তাহা অসিদ্ধ অবস্থায় জন্তুদের মত কাঁচা কাঁচা ভক্ষণ করিতাম; কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন হইতে ক্রমবিকাশ নিয়ম অনুসারে আগুন জ্বালাইবার বুদ্ধি জন্মিল তখন হইতেই ক্রমে পাক করিয়া খাইতে শিখিলাম; সে অবধি অন্ন নাম হইল। জীবাণু আমার মতে বাহিরের জিনিষ নয়—অন্নব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট। ভারতের হিন্দুজাতির অধঃপতনের মূল কারণ অন্নব্রহ্মের সাধন অবহেলা করা ব্যতীত অন্য কিছুই দেখা যায় না। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে সকল জাতি জ্ঞান-বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া সভ্য হইয়াছে সকলেই দেখা যায় আদৌ অন্নব্রহ্মের সাধন করে। তাহারা আমাদের মত কোন কর্ম্মকেই নিজ হাতে করিতে লজ্জাবোধ করে না এবং এই জন্য তাহারা আমাদের মত ছোটলোক বলিয়াও সমাজে হেয়ভাবে বিবেচিত হয় না, তাহাদের জাত যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

পারিপার্শ্বিক প্রভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটী বহুদিন হইতেই বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার একটি কেন্দ্র হইয়াছিল। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সৎসাহিত্য প্রচারের একটি প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ প্রভৃতি সাহিত্য মহারথীদিগের মৌলিক গবেষণা-প্রসূত রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার প্রচারে সহায়তা করিয়া জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া যেরূপ অপূর্ব্ব গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্ব্বে আর কোনও সাময়িক পত্রের ভাগ্যে সেরূপ গৌরবলাভ ঘটে নাই। মহর্ষি স্বয়ং বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও অকপট সেবক ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং কি তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায়, কি কাব্যচর্চ্চায়, কি নাটকপ্রণয়নে, কি সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনায় —সকল দিকেই তাঁহাদের প্রতিভা আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ সাহিত্যিক আবেষ্টনের মধ্যে লালিত হইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথও যে অল্প বয়সেই মাতৃভাষানুরাগী এবং সাহিত্যসেবায় উন্মুখ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

এই স্থানে তাঁহার বাল্যবন্ধু এবং সাহিত্যচর্চ্চার প্রধান সহযোগী ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা উচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষিদেবের বাটীর পূজার দালানে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,—"এই পাঠশালায় বাহিরের চারি-পাঁচজন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। রীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের অ্যাটর্ণি, 'ভারতী'র সাহিত্য-সমালোচক, সুলেখক, সুকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় পিতৃদেব একখানা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহাকে স্বহস্তে পুরস্কার দেন।"

রবীন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম্-এ। সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। বায়রণ এবং শেকস্‌পীয়রের রসে তিনি আগাগোড়া রসিয়া উঠিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবাবু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে-বেসুরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে-সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ-অবৈধ যাহা-কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাতে অজস্র টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্ন পত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। 'উদাসিনী' নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

"সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ। অক্ষয় বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধ-শক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"

অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল "কিঞ্চিৎ জলযোগ।"—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ—"কিঞ্চিৎ জলযোগ!" নামক প্রহসন প্রকাশিত হয়। উহাতে কিন্তু নবীন গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। তখন কেশবচন্দ্র সেন 'অগ্রসর' ব্রাহ্মদিগকে লইয়া নূতন সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন,—'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং পূর্ণমাত্রায় স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রহসনে নব্যপন্থীদলের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত আছে। * * *

এই প্রহসনের মধ্যে স্থানে স্থানে তাৎকালিক নব্যপন্থী ব্রাহ্মদিগের কোনও কোন আচরণের প্রতি রহস্য-পূর্ণ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। * *

নানা বিষয়ে হাস্যকর পরিণতি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার প্রহসনের স্থানে স্থানে অনাবশ্যক স্থলে প্রার্থনা ও অনুতাপের প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। * *

বলা বাহুল্য, নব্য ব্রাহ্মগণের মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে এই প্রহসন লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানিকে 'মিরর' অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থখানির প্রশংসাপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, অনেকে মনে করেন ক্ষুদ্র নাটক হইলেই প্রহসন হয়; 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ক্ষুদ্র নাটক নহে—যথার্থ প্রহসন এবং এইরূপ প্রহসন বাঙ্গলায় অতি অল্পই আছে। কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' বলিয়াছিলেন, "Its tendency is far from immoral." নব প্রতিষ্ঠিত ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রহসনখানি গুণগ্রাহী দর্শকগণের সমক্ষে মহা-সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন না। যদিও তিনি উহার কুফলের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্যক্তিগত ভাবে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে তিনি শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা কাদম্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহ-সজ্জার প্রতি কাদম্বরী দেবীর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি সকল দ্রব্য অতি সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন। উদ্যানরচনায় তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং শিকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ব্যায়ামের পক্ষপাতী ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও বীরাঙ্গনা করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহণে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন। সেকালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন দুইটী আরব ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন, তখন লোকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না বা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেন না।

জমিদারী কার্য্য পরিচালনা। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর তাঁহাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহাকে জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, একবার মহর্ষি জমিদারী পরিদর্শনার্থ একস্থানে গমন করিলে প্রজারা তাঁহার নৌকার অগ্রভাগ স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেয়। ইহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিরূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরুবিক্রম-নাটক। নবগোপাল মিত্র প্রবর্ত্তিত 'হিন্দুমেলা'র অনুষ্ঠানের পর হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে জনসাধারণের মধ্যে দেশ-হিতৈষণা উদ্বোধিত করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে বীর-রসাত্মক নাটক দ্বারা ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী কীর্ত্তন করিলে দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত হইতে পারে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথের সহিত কটকে জমিদারী পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁহার প্রথম স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক নাটক 'পুরুবিক্রম' রচনা করেন; গুণেন্দ্রনাথের উৎসাহে গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, কিন্তু এবারেও গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেন।

'পুরুবিক্রম' বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থখানির পরিচয় দিব।

"নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে সেকেন্দর সা (Alexander), পুরু (Porus), তক্ষশীল (Taxilus), এফোষ্টিয়ান (Hephostion) ইহারাই প্রধান; মহিলাগণের মধ্যে প্রধান ঐলবিলা—কলুপর্ব্বতের রাণী, এবং অম্বালিকা—তক্ষশীলের ভগিনী।

"মহাবীর সেকেন্দর সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারত-বিজয়ে অগ্রসর হইতেছেন, বিতস্তা নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। রাণী ঐলবিলা স্বদেশের উদ্ধারার্থে কৃতসংকল্প। তিনি অবিবাহিতা, রূপ-গুণবতী। প্রচার করিয়াছেন যে, যে কোন ক্ষত্রিয় রাজা স্বদেশের জন্য যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। মনে মনে পুরুরাজের শৌর্য্যে বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পুরুরাজ বীরত্বে তদীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। পুরুরাজ এদিকে যথার্থই বীরপুরুষ ও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। তক্ষশীলও ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—কিন্তু তক্ষশীল কাপুরুষ এবং স্বীয় ভগিনী অম্বালিকাকে সেকেন্দরকে প্রদান পূর্ব্বক

নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক। এদিকে অম্বালিকাও সেই অসদিচ্ছার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অম্বালিকাকে সেকেন্দর পূর্ব্বে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; অম্বালিকা একণে সেকেন্দরের প্রতি অনুরক্তা। ভ্রাতা-ভগিনী উভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিল যে, উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিবে। কিন্তু ঐলবিলা তক্ষশীলকে ঘৃণা করেন এবং পুরুরাজে একান্ত অনুরাগিণী, সুতরাং ঐলবিলা ও পুরুরাজ মধ্যে মনোভঙ্গ সাধনার্থ ভ্রাতা ও ভগিনী ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এদিকে সেকেন্দর রাত্রির অন্ধকারে বিতস্তা পার হইয়া আসিলেন। পুরুরাজ ও সেকেন্দরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। একজন যবন সৈনিক অন্যায় আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে আহত করিল। পুরুরাজ বন্দী ও শায়িত। ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা কতক সিদ্ধ হইল। পুরু ঐলবিলার প্রণয়ে সন্দেহ করিতে লাগিলেন ও হঠাৎ তক্ষশীলকে বধ করিলেন। পরে সেকেন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মোচন করিলেন, অম্বালিকাকে গ্রহণ করিলেন না; অম্বালিকা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুরু ও ঐলবিলার সন্দেহ ভঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের মিলন করিয়া দিলেন।

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। * * লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস-প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। * * * যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।"

আচার্য্য লালবিহারী দে সম্পাদিত "বেঙ্গল ম্যাগেজিন" দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে বলিয়াছিলেন "The story is well told; the descriptions are lively; some of the characters are well drawn, and the language is simple and idomatic."

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রেও গ্রন্থের সুখ্যাতিপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুরুবিক্রমের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বীররসাত্মক উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—উহা বীররসের খতিয়ান। তাহাই বটে! আমাদের মনে পড়ে কৈশোরে আমরা কতবার অপূর্ব্ব আগ্রহের সহিত এই নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম এবং সৈন্যগণের প্রতি পুরুরাজের সেই ওজস্বিনী বাণী তৎকালে আমাদের তরুণ হৃদয়ে কিরূপ উদ্দীপনার বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়া দিত:—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥

বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার,
অনন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥
যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত-ভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন?
"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে একথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম॥

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জলুক ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

পিতৃ-পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্রপাতি, দে'খ যেন যশোভাতি,
না হয় মলিন,—থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে, শতধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।
এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ়পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন, "গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুস্দনের নাটক ও প্রহসনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়-যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই—বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের তখন এমনই দুর্দ্দশা। এই সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশ হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। যদিও তখন স্বত্ব-সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে আমরা কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি প্রদান করিলেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে পুরুবিক্রমের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, এবং রঙ্গালয়ের দর্শকগণ সুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। ইহার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও পুরুবিক্রম অভিনীত হয়। সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের) দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ পুরু সাজিতেন এবং একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট আরব জাতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন।

পুরুবিক্রম নাটক পরে গুজরাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সিলভ্যান লেভি মহোদয় গুজরাটী সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সমালোচনকালে অবগত ছিলেন না যে গ্রন্থখানি মৌলিক নহে—উহা বঙ্গসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদ মাত্র।

রাগ-বিবোধ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সোমেশ্বর-কৃত)

(পণ্ডিত ৺হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত)

অত্র শ্রুতি-স্বরাদ্যা বীণাভেদাঃ স্বসংখ্যয়া মেলাঃ।
রাগাস্তদ্রূপাণি চ পঞ্চবিবেক্যা ক্রমাৎ জ্ঞেয়ং। ৮

এই গ্রন্থে পঞ্চ বিবেক দ্বারা শ্রুতি ও স্বরাদি, বীণা-ভেদ, স্বসংখ্যার সহিত মেল, রাগ ও তাহার রূপ-সকল ক্রমে জানা যাইবে। ৮

এই গ্রন্থে বক্ষ্যমাণ পদার্থ-সকল উল্লিখিত হইতেছে। প্রাকরণিক পদার্থ-সমূহ যাহাতে বিবেচিত হয়, তাহাই বিবেক। এস্থলে ইহা অধ্যায়-সর্গাদির ন্যায় একটা অবচ্ছেদক মাত্র। এই গ্রন্থে পাঁচটী বিবেক দ্বারা পদার্থ নির্ণীত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম বিবেকে শ্রুতি ও স্বরাদি-প্রদর্শিত হইতেছে। 'আদি' পদে শ্রুতিজ্ঞানোপায় স্বর-সমূহের শুদ্ধত্ব বিকৃতত্ব মন্দ্রত্বাদি বাদি-বিবাদিত্বাদি গ্রাম, লক্ষণ, মূর্চ্ছনা, ক্রম, খাড়ব, ঔড়বিত, শুদ্ধতান, কূটতান, প্রস্তারাদি বর্ণভেদ, চতুস্ত্রিংশৎ অলঙ্কার ও গ্রহাংশন্যাস ইত্যাদির সংগ্রহ থাকিবে। দ্বিতীয় বিবেকে বীণা ও শুদ্ধ ও মেলা প্রভৃতি বীণাভেদ কথিত হইবে। তৃতীয় বিবেকে স্বীয় সংখ্যার সহিত মেল—যাহাতে রাগ-সকল মিলিত অর্থাৎ রাগের আশ্রয়ীভূত স্বরসংস্থান-বিশেষ—যাহাকে ঘাট বলে—সেই মেল সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে সংখ্যা শব্দের উল্লেখ করায়, প্রস্তার নষ্টোদ্দিষ্ট সকলও উপলক্ষিত হইতেছে। তাহা হইলে, প্রস্তার নষ্টোদ্দিষ্ট ইত্যাদিই মেল। চতুর্থ বিবেকে তত্তৎ-কাল-গেয় গ্রহাদি খাড়বত্বাদি রাগ-সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চম বিবেকে রাগসমূহের লক্ষ্য-প্রসিদ্ধ নাদময় যে সমস্ত স্বরূপ আছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে। ৮

পুরুষার্থসার্থসিদ্ধ্যৈ সিষেবয়িষুরপি বিরিঞ্চি-হরি গিরিশান্।
নাদমুপাসীত সুধীর্যদিমে গদিতাস্তদাত্মানঃ। ৯

সুধী ব্যক্তি বিরিঞ্চি হরি গিরিশকে সেবা করিতে ইচ্ছুক হইলেও পুরুষার্থ-সমূহ-সিদ্ধির জন্য নাদকে উপাসনা করিবে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেবতা নাদাত্মক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৯

ভাল, রাগবিবোধের নিমিত্ত আরব্ধ গ্রন্থে এইরূপ বস্তু সংগ্রহ হউক, কিন্তু রাগবিবোধনের কি প্রয়োজন এই আশঙ্কায় আদি-পদাদ্বয়ে সূচিত—প্রতিপাদ্য রাগরূপ নাদ উপাস্য বলিয়া গ্রন্থকার এই শ্লোকে বিধান করিতেছেন। পুরুষার্থ-সমূহের সিদ্ধির জন্য সুধী ব্যক্তি নাদ উপাসনা করিবেন। ভাল, লোকে ধর্ম্মাদি সিদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদি দেবতার তো উপাসনা করিয়া থাকে, তবে এস্থলে নাদের কথা কেন হইতেছে? ইহার উত্তর এই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মাদি দেবগণকে সেবা করিতে ইচ্ছুক, তিনিও নাদেরই উপাসনা করিবেন। যেহেতু, ব্রহ্মাদি দেবগণ এই নাম হইতে অভিন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই, ভক্তেরা যুগপৎ ব্রহ্মাদি দেবতা-ত্রয়ের উপাসনা করিতে সমর্থ নহে, এই জন্য একমাত্র নাদ উপাসিত হইলে, ঐ তিনই উপাসিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে শার্ঙ্গদেব কহিয়াছেন—নাদোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে, যেহেতু ইঁহারা তদাত্মক। ৯

আত্মেরয়তি বিবক্ষুশ্চিত্তং তদ্দেহবহ্নিমাহন্তি।
স প্রেরয়তে দীপ্ত্যা ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং মরুতং। ১০
উর্দ্ধং বিচরন্ ক্রমতো নাভিহৃদয়-কণ্ঠ-মূর্দ্ধবক্ত্রে সঃ।
অতি সূক্ষ্মাদিকসজ্ঞান্ নাদাংস্তনুতেঽত্র গানার্হাঃ। ১১

বাক্‌প্রয়োগেচ্ছু আত্মা মনকে প্রেরণ করে, মন দেহবহ্নিকে আঘাত করে, ঐ বহ্নি ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত বায়ুকে দীপ্তি-দ্বারা প্রেরণ করে, ঐ বায়ু ক্রমে উর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নাভি-হৃদয়-কণ্ঠ-মূর্দ্ধা ও বক্ত্র মধ্যে অতি সুক্ষ্মাদি নামক নাদ বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে হৃৎ, কণ্ঠ, মূর্দ্ধনাদ এই তিনটি গান-যোগ্য। ১০। ১১

এক্ষণে নাদের অভিব্যক্তিক্রম কথিত হইতেছে। আত্মা অর্থাৎ জীব কথা কহিবার জন্য মনকে প্রেরণ করেন। ঐ মন আবার ঔদর্য্য বহ্নি জঠরাগ্নিকে আঘাত করে। ঐ অগ্নি আবার ব্রহ্মগ্রন্থিস্থ—(আধার-চক্র হইতে উর্দ্ধ দুই অঙ্গুলি ব্যবধানে দেহ-মধ্য নামক চক্র, তাহা হইতে উর্দ্ধে নয় অঙ্গুলি ব্যবধানে অভিকন্দ—উহাই ব্রহ্মগ্রন্থি) বায়ুকে উষ্মা দ্বারা অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে চালনা করে। "নিঃশঙ্ক" ব্রহ্মগ্রন্থির পূর্ব্বোক্তরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রমে ঐ বায়ু উর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নাভি-হৃদয়-কণ্ঠ-মস্তক ও মুখে—নাভি প্রভৃতি পাঁচটা স্থানে ক্রমশঃ অতিসূক্ষ্মাদি নামক—অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্টাপুষ্ট ও কৃত্রিম নামক নাদসকল প্রকাশ করিয়া থাকে। নিঃশঙ্কের মতে, নাভিতে অতিসূক্ষ্ম ইত্যাদি ক্রম। কিন্তু মতঙ্গের মতে, হৃদয়ে অতিসূক্ষ্ম কথিত হইয়াছে। এইস্থলে নাভি প্রভৃতি পাঁচটীরই সামান্যত গীতোপযোগিতা থাকিলেও, হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকেই বক্ষ্যমাণ শ্রুতি-স্থান নাড়ী-সমূহ অবস্থিত বলিয়া এই তিনেরই গীতোপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১১

হৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধনাদাঃ ক্রমাদমী মন্দ্রমধ্যতারাখ্যাঃ।
দ্বিগুণা যথোত্তরং চ শ্রুতিতাং স্বরতাং চ বচ্মি চৈতেষাং। ১২

এই হৃৎ কণ্ঠ ও মূর্দ্ধনাদ-সকল ক্রমে মন্দ্র মধ্য ও তার নামে অভিহিত এবং এই সমস্ত নাদ উত্তরোত্তর-দ্বিগুণ। ইহাদের শ্রুতিস্বরূপতা ও স্বর-রূপতা কহিতেছি। ১২

এই হৃৎ, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধনাদ সকলই ক্রমে মন্দ্র মধ্য ও তার নামে কথিত হয়, এবং ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। হৃৎনাদ মন্দ্র, কণ্ঠনাদ মধ্য ও মূর্দ্ধনাদ তার। এই সমস্ত নাদ উচ্চারণপ্রযত্নে পরপর দ্বিগুণ। অর্থাৎ মন্দ্র নামক হৃৎনাদের পরবর্ত্তী যে কণ্ঠনাদ, উহা দ্বিগুণপ্রযত্নসাধ্য বলিয়া দ্বিগুণ। আর তদুত্তর তার-নামক যে মূর্দ্ধনাদ, উহা তাহা হইতে ঐরূপে দ্বিগুণ। এইরূপে পাঁচের মধ্যে তিনের গীতোপযোগিতা, নামান্তর ও স্বরূপ-ভেদ কহিয়া নাদ-সমূহের শ্রুতিভাব ও স্বরভাব ব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। স্থানত্রয়-ভেদে বিভিন্ন নাদসমূহের শ্রুতিস্বরূপতা ও স্বররূপতা কহিতেছি। ১২

হৃদূর্দ্ধনাড়িকাস্থদ্বাবিংশত্যণুতিরোজনাড়ীষু।
তাবন্তঃ শ্রুতিসংজ্ঞাঃ স্যুর্নাদাঃ পরপরোচ্চোচ্চাঃ। ১৩

হৃদয়ের উর্দ্ধ যে নাড়ী তৎসংস্থিত দ্বাবিংশতি সংখ্যক সূক্ষ্ম তিরশ্চীন যে সকল নাড়ী তৎসমূহে তাবৎ নাদই শ্রুতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সমস্ত নাদ পরপর উচ্চ হইতে উচ্চ। ১৩

হৃদয়ের উর্দ্ধ যে নাড়ী সুষুম্না বা হৃদয়ের উর্দ্ধ যে দুই নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলা, তৎসংলগ্ন তির্য্যকভাবে ন্যস্ত আর যে দ্বাবিংশতি সংখ্যক সূক্ষ্ম নাড়ী অর্থাৎ সচ্ছিদ্র নলি আছে, তৎসমূহে দ্বাবিংশতি নাদ—যাহা বায়ুর আঘাতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে—তাহাই শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই নাদসকল পরপর উচ্চোচ্চ অর্থাৎ পর-পর উচ্চ হইতে উচ্চ। অর্থাৎ প্রথম হইতে পরবর্ত্তী দ্বিতীয়টি উচ্চ, তাহা হইতে পরবর্ত্তী তৃতীয়টি আরও উচ্চ। ঐ দ্বাবিংশতিটি এইরূপই জানিবে। ইহার ভাব এই, সোপানপরম্পরার ন্যায় বায়ু দ্বাবিংশতি সচ্ছিদ্র নলিতে আরোহণ করায় উচ্চতার পরম্পরা-ক্রমে পৃথক দ্বাবিংশতি শ্রুতি বিস্তার করিয়া থাকে। ১৩

[৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন্তব্য—নাদ অর্থাৎ কণ্ঠধ্বনি উৎপাদনের প্রকরণ-ক্রম এই গ্রন্থে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে :—প্রথমে আত্মা অর্থাৎ জীব কথা কহিবার জন্য মনকে প্রেরণ করে; মন আবার দেহ-অগ্নি অর্থাৎ জঠরাগ্নিকে আঘাত করে। ঐ অগ্নি আবার ব্রহ্মগ্রন্থি নামক দেহের কোন গ্রন্থি-বিশেষে স্থিত বায়ুকে দীপ্তির দ্বারা উর্দ্ধে চালনা করে। ক্রমে ঐ বায়ু উর্দ্ধে বিচরণ করিয়া নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও মুখে—অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্টাপুষ্ট ও কৃত্রিম নাদ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থে কেবল হৃদয়, কণ্ঠ ও মস্তকের শ্রুতি-স্থান ও গীতোপযোগিতাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই হৃদয়-নাদ, কণ্ঠ-নাদ ও মূর্দ্ধ-নাদ ক্রমান্বয়ে মন্দ্র, মধ্য ও তার নামে কথিত হয়। এবং ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর উচ্চ।

আধুনিক য়ুরোপীয় শব্দ-বিজ্ঞানের সহিত ইহার মিল নাই। এখনকার শারীর-বিজ্ঞান-অনুসারে ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু নির্গত হইয়া কণ্ঠস্থিত বাক্-তন্তুকে আঘাত করে। এবং ইহা হইতেই কণ্ঠস্বর উৎপন্ন হয়। নাভি হইতে বায়ু ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধায় নাদ উৎপাদন করে—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। আধুনিক মতে, কণ্ঠস্থিত বাক্-তন্তুর আপেক্ষিক সঙ্কোচ ও শিথিলতা হইতেই মন্দ্র, মধ্য, তারধ্বনি উৎপন্ন হয়। সেই প্রাচীনকালে দেহ-যন্ত্র-তত্ত্বের তেমন অনুশীলন না থাকায়, পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা নিজের মানসিক অনুভব হইতেই এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

যখন আমরা মন্দ্র অর্থাৎ খাদ-স্বর কণ্ঠ হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করি, তখন বুক ফুলাইয়া প্রয়াস-সহকারে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি; তখন মনে হয় যেন বক্ষঃস্থল হইতে স্বর নির্গত হইতেছে; এবং তার স্বর—অর্থাৎ উচ্চ সপ্তকের সুর বাহির করিবার সময় যখন আমরা মুখ সিট্‌কাইয়া, দুই হাতে দুই কান চাপিয়া, সেই সুর অতি কষ্টে বাহির করি, তখন মনে হয়,—যে সুর বাহির করিতে মাথা যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে, সে সুর অবশ্য মস্তক হইতেই উৎপন্ন হইবে। এ সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত কি, তাহা "গীত-সূত্র-সার" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"গলদেশে দুইটি নালী ; একটি অন্ন-নালী—যদ্দ্বারা খাদ্য উদরস্থ হয়, সেটি ভিতর দিকে ; অপরটি শ্বাসনালী, যদ্দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয়, এটি সম্মুখের দিকে। এই শ্বাসনালী দিয়াই কথা ও গান উচ্চারণ হয়। * * * * শ্বাস-নালীর উপর-প্রান্তে দুইখানি পাতলা ক্ষুদ্র ত্বক্ থাকে, তাহারা বায়ু দ্বারা কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদন করে। ঐ ত্বক্-দুইখানিকে "বাক্-তন্তু" (ভোকাল বার্ডস্) নামে কহা যায়। উহারা নলের মুখে সাম্‌না-সাম্‌নি পড়িয়া থাকে। শব্দ করার ইচ্ছা হইলে, কণ্ঠস্থ পেশী দ্বারা বাক্-তন্তুদ্বয় উত্থিত হয় ; তখন ফুস্‌ফুস্ নামক হৃদয়স্থ বায়ুকোষ হইতে বায়ু আসিয়া উহাদিগকে কম্পিত করিলে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অতএব ফুস্-ফুস্ ও বাক্-তন্তু, এই দুই সামগ্রী, কণ্ঠস্বরের মূল উপাদান। * * * শ্বাসনালীর মুখ-দেশের নাম "লারিংস" ; তাহা বৃত্তের ন্যায় গোল। সেই বৃত্তের দুই দিকে, ভিন্ন স্থানে, বাক্‌তন্তু-দ্বয় একটির সম্মুখে অপরটি অবস্থিতি করে। ইহারা বায়ুর প্রতিঘাতে সমস্বরে ধ্বনিত হয় ; এবং ইহারা পেশী দ্বারা সঙ্কর্ষিত হইলে ধ্বনি উচ্চ হয় ; ও ঢিল পড়িয়া স্থূলীকৃত হইলে, ধ্বনি গম্ভীর হয়। সেই সকল ধ্বনি মুখ-গহ্বরের স্থানে স্থানে, যথা—তালুতে, গণ্ডে, দন্তে, প্রতিধ্বনিত হইয়া, প্রবলতা ধারণ করত নির্গত হয়।]

সংবাদ।

উপাধিলাভ—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিষয়ে একটী 'থিসিস' লিখিয়া সম্প্রতি 'লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়' হইতে সসম্মানে 'পি-এইচ. ডি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই যোগ্য সম্মানলাভে আমরা তাঁহাকে সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি।

শোক-সংবাদ।

৺হিরণ্ময়ী দেবী—পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পি. মুখার্জ্জি স্কোয়ার) মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী গত ২৯শে আষাঢ় সোমবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় স্বীয় বাসভবন ৫৪নং হাজরা রোড বালিগঞ্জে পরলোকগত হইয়াছেন। সমাজসংস্কার কার্য্যে ইহাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। ইনি "মহিলা-শিল্পাশ্রমের" প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরাশ্রয় বিধবা রমণীদিগের সগৌরবে জীবিকার্জ্জনের একটী নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও ইহাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম ছিল। এক সময়ে ইনি বহুদিন যাবৎ 'ভারতী'র সম্পাদকতা কার্য্য কৃতিত্বের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। এখনও ইহাঁর বৃদ্ধা জননী জীবিতা রহিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। ইহাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত্ত পতি-পুত্র-পরিজনদিগকে আমরা আমাদের প্রগাঢ় সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

৺হিরণ্ময়ী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮॥০ ঘটিকার সময় শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে ৺হিরণ্ময়ী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাতে থাকায় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁহার বাসভবন ৫৪নং হাজরা রোড, বালিগঞ্জে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ-পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীগ্রহণ করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে দানসামগ্রী যথারীতি উৎসর্গীকৃত এবং শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। ৺হিরণ্ময়ী দেবীর একমাত্র জামাতা শ্রীমান্ অজিতকুমার তাঁহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠে সময়োপযোগী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সভাস্থলের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয় ।

১৮৪৬ শক, সন ১৩৩১ সাল আদিব্রাহ্মসমাজ

পূর্ব্বকার স্থিত	১৶৴০
আয়	৫৯৮০৸৬
সমষ্টি	৫৯৮২॥/৬
ব্যয়	৫৯৩২ /১॥০
স্থিত	৫০॥৪॥০

আয় ।

১৮৪৬ শক, ব্রাহ্মসমাজ ।

* বাৎসরিক দান	৩৲
* এককালীন দান	১২৩।/০
দানাধারে প্রাপ্ত	২৶৬
মাসিক দান	২৯০০৲
* আনুষ্ঠানিক দান	২৫৲
* মাঘোৎসবের দান	২৪॥০
বণ্ডেড-ওয়ার-হাউজ	১০৲
হাওলাত জমা	৭॥০
হাওলাতশোধ-প্রাপ্তি	৪৲
মাশুল	১৷৶০
সমষ্টি	৩১৯০৸৵৬

তত্ত্ববোধিনী ।

*হাল মূল্য	৮৩৸০
* বকেয়া মূল্য	২১৬৶০
নগদ বিক্রয়	৮।৶৬
বিজ্ঞাপন	৩০৯॥০
* অগ্রিম মূল্য	১২৲
মাশুল	২০৻৩
সমষ্টি	৬৫০৵৯

পুস্তকালয় ।

সমাজের পুস্তক	১৮৪৶/০
গচ্ছিত পুস্তক	৬৭৶০
মাশুল	১৩৫৸/০
সমষ্টি	৩৮৭৶/০

যন্ত্রালয় ।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	১১৫৪৸০
কাগজের মূল্য	২৭৪৲
দপ্তরীর দরুণ	৩১২।৯
বিবিধ	১০৸/৬
সমষ্টি	১৭৫১৸/৩

ব্যয় ।

১৮৪৬ শক, ব্রাহ্মসমাজ ।

আচার্য্যের পাথেয়	১৪০৲
গায়ক	৫৪০৲
হারমোনিয়ম বাদক	২২৲
কার্য্যাধ্যক্ষ	১৩১॥৵০
হিসাব রক্ষক	৫৯॥৵০
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২৪৲
ইলেকট্রিক	৪৯৶/৯
ট্যাক্স	২৩৬।৵০
লাইসেন্স	১২৲
কেরোসিন তৈল	৮॥/৬
আলো মেরামত	৬৶/০
পাঙ্খাকুলী	১৲
পাঙ্খা মেরামত	১৫৲
মাঘোৎসব	১০৪।০
সরঞ্জামি	৬॥/৯
হাওলাত প্রদান	১৯॥৩
হাওলাত শোধ	৭॥০
পুরস্কার	৪৲
পেন্সন	২০৲
পার্ব্বণী	৪৲
সাহায্য	১॥০
ভবানীপুর-উৎসব	১০৲
ডাকমাশুল	১৮॥৬
পাইখানা	১।৵০
বিবিধ	১২৯৶/৯
ড্রেণ ইত্যাদি	/৬
আসবাব	১১৵৭॥০
পূর্ত্তকার্য্য	১৪৪।০
কাগজ ক্রয়	২৯৶০
সমষ্টি	১৯০২৸৪॥০

তত্ত্ববোধিনী ।

কাগজ	২৫৮৸০
প্রবন্ধ	৩৪/৬
মাশুল	৭২॥৵৯
কার্য্যাধ্যক্ষ	১২২৵৯
হিসাব রক্ষক	৫৩/৯
বিজ্ঞাপন	৬৵০
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১০৩।৵০
মূল্য আদায়ের কমিশন	৩৯৶৯
বাঁধাই	৫৩॥৯
অন্যান্য	৪০॥৶৬
সমষ্টি	৭৮৪৻৯

পুস্তকালয় ।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	১৫৲
গচ্ছিত পুস্তকের কমিশন	৬।৵৯
হিসাব রক্ষক	৫১৸০
মূল্য ফেরত	৸৵০
পুস্তক ক্রয়	৬৸/৬
সমাজের পুস্তকের কমিশন	২৪৸৵৯
সমাজের পুস্তক বাঁধাই	৫২৻৬
অপরের পুস্তক বাঁধাই	৩৫৲

* ১৩৩ ও ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

বিজ্ঞাপন	৪৯৮৶৬
মাশুল	১৪৮৵০
অন্যান্য	৫৪।৬
সমষ্টি	৪৪৫৮৶৬

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৭৫৲
কম্পোজিটর	৫৬৮॥/৩
প্রেসম্যান	২২২৵০
ইঙ্কম্যান	২১৬৲
কাগজতোলা	৮১৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৩০৯৶৯
কার্য্যাধ্যক্ষ	১৩৫॥৶৬
প্রেসের কালি	১১।/৬
অক্ষরক্রয়	১৪৸৴০
লেড	২৮৴০
থার ক্রুস	১॥০
রুলঢালা	৩।৶৩
সাজিমাটি	২।৶৬
শিরিষ	৪৻৬
দপ্তরী	১০১৶৩
ছাপার কাগজ—অপরের	৬৮১৸৴৯
প্রুফ কাগজ	৭॥/০
প্রেসের তৈল	৬।৶৬
তামাক-টিকা	৪॥/৬
জলপানি	২৭৶৬
বাতি	৭॥৴০
মাশুল	২॥/৬
মুটে	১৭৵০
দড়ি	৸০
লেই	১।/৩
বিবিধ	২৫৸৴০
গীতা-মুদ্রণ	১৯।০
ব্লক	২২॥০
সমষ্টি	২৭৯৯।/৬
গচ্ছিত খরচ	৪৯৫১/৩
গচ্ছিত আদায়	৪৯৪৪৶৭॥০
স্থিত=	৬৵৭৷০

দান-প্রাপ্তি স্বীকার।

এককালীন দান।

১৮৪৫ শক।

(১৮৪৫ শকের আয়-ব্যয় গত বৈশাখ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

স্যর আশুতোষ চৌধুরী (নববর্ষ উপলক্ষে)	১০৲

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বরী শুকুল	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
" " সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৲
	১৫৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
" " প্রভাসচন্দ্র দত্ত	১৲
" " ভগবতীচরণ মিত্র	১৲
" " অবনীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	১৲
" " হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
" " তুলসীদাস দত্ত (১৮৪৪ ও ৪৫ শকের দরুণ)	২+২=৪৲
" " পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
" " বিজয়চন্দ্র সিংহ	৫৲
" " দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৲
	২১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

স্যর আশুতোষ চৌধুরী (৺প্রতিভা দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে)	৫০৲

এককালীন দান।

১৮৪৬ শক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ চন্দ্র (তাঁহার পিতা ৺ বনমালীচন্দ্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে)	৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু পান্নালাল দে (সমাজের হিতার্থে)	৬৵০
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু শিতিকণ্ঠ মল্লিক (সমাজের হিতার্থে স্থায়ী তহবিলরূপে)	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া	॥০
	১২৩।/০

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ চন্দ্র	১৲
শ্রীযুক্তা মনীষা দেবী	১৲
	৩৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বরী শুকুল	২৲
" " মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৲
" " কার্ত্তিকচন্দ্র বক্‌সি	২৲
" " অমৃতলাল গুপ্ত	১৲
" " যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
" " ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" " সুখলাল রায়	॥০
" " ভগবতীচরণ মিত্র	১৲
" " রবীন্দ্রকৃষ্ণ বসু	১৲
" " হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
" " শ্যামলাল সরকার	৫৲
" " বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
" " তুলসীদাস দত্ত	২৲
	২৪॥০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্তা সুষমা দেবী (বিবাহ উপলক্ষে)	১০৲

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাশ গুপ্ত (তদীয় কন্যা ৺মনোরমা দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে)	৫৲
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী (মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে)	১০৲
	২৫৲

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

১৮৪৫ শক ।

(১৮৪৫ শকের আয়-ব্যয় গত বৈশাখ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

বকেয়া।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ (১৮৪৩ শক)	১৲
" শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪৩-৪৪ শক)	৬৲
" হৃদয়নাথ আচার্য্য (১৮৪১-৪৩ শক)	৭৲
" প্রমথনাথ প্রামাণিক (১৮৪০-৪১ শক)	৬৲
রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু (১৮৪১ শক)	২৲
কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন (১৮৪৩ শক)	১৶০
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (১৮৪৪ শক)	৩৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ (১৮৪৪ শক)	২৲
শ্রীপাচুগোপাল মল্লিক (১৮৪৩-৪৪শক)	৫৲
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র পাল (১৮৪৩ শক)	২৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪৩-৪৪ শক)	৬৲
শ্রীতুলসীদাস দত্ত (১৮৪৪ শক)	৩৲
শ্রীযুক্তা রেণুকা গাঙ্গুলী (১৮৪০ শক)	২৶০
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৪০ শক)	১॥০
" (১৮৪১ শক)	১॥০
" (১৮৪২ শক)	।৵০
শ্রীফকিরচন্দ্র নাথ (১৮৪০ শক)	২৲
শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দাস (১৮৪০ শক)	২৲
	৫৪৲

হাল।

রায় শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষ্ণ বসু বাহাদুর (১৮৪৫ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫ শক)	৩৲
" দেবনারায়ণ দে (১৮৪৫ শক)	৩৲
মহামান্য ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইন্সট্রাক্সান (১৮৪৫ শক)	২৪৲
শ্রীললিতমোহন পাল (১৮৪৫ শক)	৩৲
" যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (১৮৪৫ শক)	৩৲
" দীনেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (১৮৪৫ শক)	৩৲
" গোপালদাস চৌধুরী জমিদার (১৮৪৫ শক)	৩৲
" বরদাপ্রসন্ন রায় (১৮৪৫ শক)	২৲
" হরিদাস জীবরাজ (১৮৪৫ শক)	২৲
" তুলসীদাস দত্ত (১৮৪৫ শক)	৩৲
" বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৲
	৫৫৲

অগ্রিম।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত (১৮৪৬ শক)	১॥০

১৮৪৬ শক।

বকেয়া।

শ্রীলাবণ্যলতা চন্দ (১৮৪৪ শক)	॥৴০
" (১৮৪৫ শক)	২৶০
রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল (১৮৪৪ শক)	২৲
" (১৮৪৫ শক)	২৲
শ্রীশিশিরকুমার দত্ত (১৮৪৫ শক)	১॥০
" প্রফুল্লকৃষ্ণ বাগচি (১৮৪৩ শক)	২৲
লেডি ডাঃ সরোজিনী ঘোষ (১৮৪৪ শক)	২৲
" (১৮৪৫ শক)	১৲
শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র (১৮৪৫ শক)	৩৲
মিসেস্ এস্ হালদার (১৮৪৫ শক)	২৲
শ্রীপান্নালাল দে (১৮৪৫ শক)	৩৲
মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান (১৮৪৩-৪৫ শক)	৯৲
রায় সাহেব নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় (১৮৪২ শক)	১৴০
" (১৮৪৩ শক)	৩৲
" (১৮৪৪ শক)	৩৲
" (১৮৪৫ শক)	১॥৴০
শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৫ শক)	৩৲
" হরিপদ ত্রিবেদী (১৮৪১ শক)	২৲
পি এন দত্ত স্কোয়ার (১৮৪৫ শক)	৩৲
শ্রীপান্নালাল মিত্র (১৮৪৫ শক)	২॥৶০
কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন (১৮৪৪-৪৫ শক)	৬৲
শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় (১৮৪৪-৪৫ শক)	৬৲
" সতীশচন্দ্র মল্লিক (১৮৪৫ শক)	৬৲
" বিজয়চন্দ্র সিংহ (১৮৪৫ শক)	৩৲
" অবিনাশচন্দ্র পাল (১৮৪৪-৪৫ শক)	৪৲
" চারুচন্দ্র বসু (১৮৪৫ শক)	৩৲
মহারাজা শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর (১৮৪৫ শক)	৩৲
কুমার শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক (১৮৪৫ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দোয়ারা (১৮৪৫ শক)	৩৲
" লালবিহারী বসাক (১৮৪৪ শক)	৩৲
" পাঁচুগোপাল মল্লিক (১৮৪৪-৪৫ শক)	৪৲
রাজা ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় (১৮৪১ শক)	৩৲
" (১৮৪২ শক)	৩৲
" (১৮৪৩ শক)	॥৶০
রাজা অরুণচন্দ্র সিংহ (১৮৪৫ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক (১৮৪৪-৪৫ শক)	৬৲
" যোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৮৪৩-৪৫ শক)	৯৲
" অনাদিচরণ পাল (১৮৪৫ শক)	৩৲
" সুরেন্দ্রনাথ বসাক (১৮৪৪-৪৫ শক)	৩৲
" শ্যামলাল সরকার (১৮৪৫ শক)	৩৲
রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু (১৮৪১ শক)	১৲
" (১৮৪২ শক)	১৸৴০
" ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-৪৫ শক)	১০৲
" ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী (১৮৪৫ শক)	২৲
" কালিদাস রায় (১৮৪২-৪৩ শক)	৬৲
" সুবিনয় রায় (সসপেন্স রূপে)	৫৲
" প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য (১৮৪৫ শক)	২৲

জি. সি. চৌধুরী স্কোয়ার (১৮৪৩-৪৫ শক)	৯৲
শ্রীযুক্ত আনন্দপ্রকাশ ঠাকুর (১৮৪৩-৪৫ শক)	৯৲
„ ভগবতীচরণ মিত্র (১৮৪৫ শক)	১৷৷০
„ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪৫ শক)	৩৲
„ রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪১-৪৩)	৯৲
ডাঃ এস্. বি. মিত্র	১০৲
ডাঃ জি. এল. গুপ্ত (১৮৪৫ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সিংহ (১৮৪৫ শক)	২৲
„ লালবিহারী বসাক (১৮৪৫ শক)	৩৲
„ প্রফুল্লকৃষ্ণ বাগচি (১৮৪৪ শক)	২৲
„ হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য (১৮৪৪-৪৫ শক)	৬৲
„ দ্বারকানাথ ঘোষ (১৮৪৩-৪৫ শক)	৫৲

১৮৪৬ শক।

হাল।

শ্রীলাবণ্যলতা চন্দ (১৮৪৬ শক)	।০
শ্রীশিশিরকুমার দত্ত (১৮৪৬ শক)	১৷৷০
মিসেস্ এস্. হালদার (১৮৪৬ শক)	২৲
রায় শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষ্ণ বসু বাহাদুর (১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৬ শক)	৩৲
„ হরিচরণ নিয়োগী (১৮৪৬ শক)	৩৲
রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র বানার্জ্জি (১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীযুক্তা হেমমালা বসু (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীমতী শক্তি দেবী (১৮৪৬ শক)	২৲
মিসেস জে. সি. মুখার্জ্জি (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্তা কমলাবালা দেবী (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত (১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত সুনন্দিনী দেবী (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিত্র (১৮৪৬ শক)	৩৲
„ কৃষ্ণরাম দে (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ দে (১৮৪৬ শক)	৩৲
„ রবীন্দ্রনারায়ণ বসু (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্তা সয়েদা ফয়জুন্নেসা (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন (১৮৪৬ শক)	৩৲
„ বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬ শক)	৩৲
হেমনলিনী বিশ্বাস (১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত	৩৲
মহামান্য ডিরেকটর অফ্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শান	২৪৲
	৮৩৸০

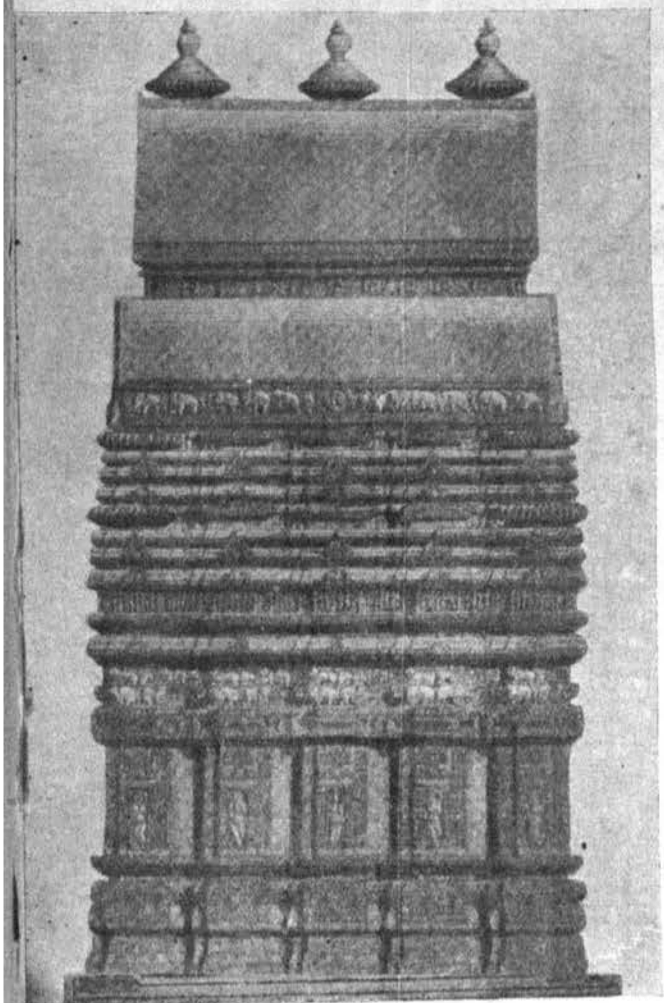
অগ্রিম

শ্রীমতী শক্তি দেবী (১৮৪৭ শক)	১৲
শ্রীসূর্য্যকুমার দাস (১৮৪৭ শক)	৩৲
„ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭ শক)	৩৲
ডি. এন্ বানার্জ্জি স্কোয়ার (১৮৪৭ শক)	২৲
জে. এন্. দত্ত. স্কোয়ার (১৮৪৭ শক)	২৲
	১২৲

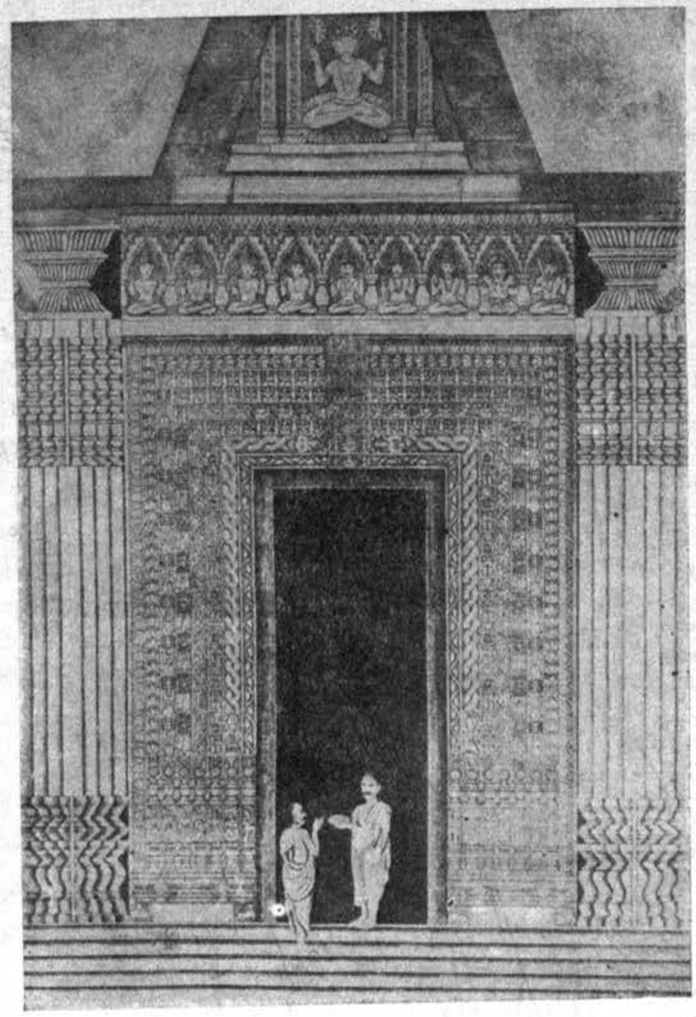
সুসংবাদ— সুসংবাদ—

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে দুষ্প্রাপ্য ফটো-চিত্র সম্প্রতি আমরা প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করিতেছি, আগামী "ভাদ্রোৎসব" উপলক্ষে 'ভাদ্র' ও 'আশ্বিন' এই দুইমাস আমরা উহা অর্দ্ধমূল্যে তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহক ও মহর্ষি-দেবের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের গৃহে গৃহে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছি। তত্ত্ববোধিনীর নূতন ও পুরাতন গ্রাহক-দিগের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য দিবেন তাঁহাদিগকে আমরা মাত্র প্যাকিং ও রেজেষ্ট্রী খরচা বাদে চারি আনা লইয়া উক্ত ছবিখানি উপহার প্রদান করিব। যাঁহারা কেবল মহর্ষিদেবের চিত্রখানি লইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিমিত্ত উক্ত দুই মাসের জন্য মাত্র প্যাকিং ৷৷০ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল।



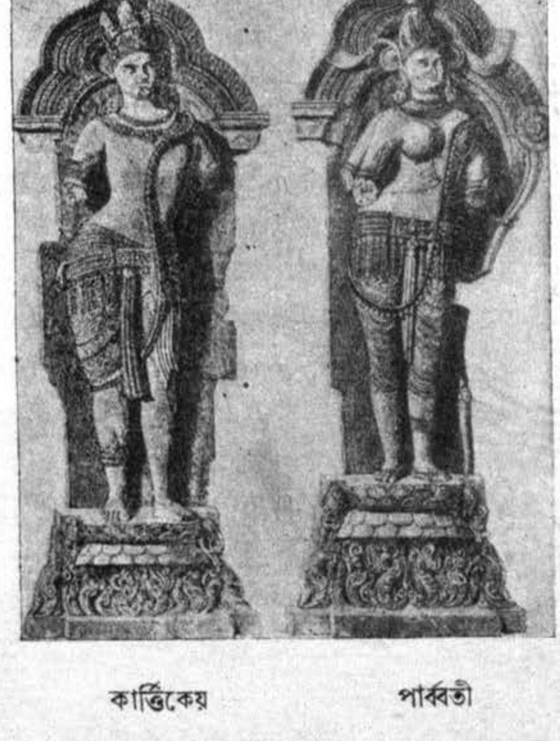
বৈতালেশ্বরের মন্দির—ভুবনেশ্বর।



কোণার্কের প্রবেশ দ্বার।



মুক্তেশ্বর মন্দির—ভুবনেশ্বর
ছাদের ভিতরের কারুকার্য্য



কার্ত্তিকেয় পার্ব্বতী